শিক্ষাপ্রচার

(অধ্যাপক ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পি এইচ ডি, ডি এস্
সি. সি আই ই, কর্তৃক লিখিত ভূমিকা সম্বলিত)

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্, এ,
অধ্যাপক,—কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর

চৈত্র ১৩১৯

শ্রমজীবি-শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায় কর্তৃক
৯৩।২ বৈঠকখানা রোড্, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

মূল্য ।৽

শিক্ষাপ্রচার

(অধ্যাপক ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পি এইচ ডি. ডি এস্‌
সি, সি আই ই. কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা সম্বলিত)

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম, এ,
অধ্যাপক,—কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর।

চৈত্র ১৩১৯

শ্রমজীবি-শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায় কর্ত্তৃক
৯৩।২ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

সূচী

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

কাদাই নৈশবিদ্যালয় (মুর্শিদাবাদ)

India Press, Calcutta.

ভূমিকা

[বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পি এইচ্ ডি, ডি এস্ সি, সি আই ই, কর্ত্তৃক লিখিত]

আমরা আজ কাল বড় বড় কথা বলিতে শিখিয়াছি—'দেশকে তুলিব', 'দেশকে জাগাইব', কিন্তু দেশ যে কুম্ভকর্ণের ঘোর নিদ্রায় অভিভূত তাহা একবারে ভুলিয়া যাই। জমিতে বীজ ছড়াইয়া চাষী যদি পরিশ্রম না করে, শুধুই চীৎকার করিতে থাকে,—'খুব ফসল পাইব', 'খুব লাভ করিব', তাহা হইলে তাহাকে যেমন পরিণামে ঠকিতে হয়, আমাদিগেরও সেই দশা হইতেছে। জমিতে শুধু বীজ বপন করিলে চলেনা, জমির চাষ দরকার, অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া জমিতে সার-লাঙ্গল দিতে হয়, মাথার ঘাম পায়ে না ফেলিলে চাষী ফসল পায় না। সেরূপ দেশকে তুলিতে হইলে বক্তৃতাদ্বারা কতকগুলি ভাল কথা প্রচার করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। সমাজের অসংখ্য লোক একেবারেই মূঢ় মূক,—দেশের কোন চিন্তা কোন আলোচনাই তাহাদিগকে স্পর্শ করে না—চারিদিকে কত আলো, কত ভাবের আবেগ কিন্তু কই উঁহাদিগের ত কোন চেতনাই নাই। এই শ্যামল সুষমা-সৌন্দর্য্য-ভরা দেশে কে যেন উহাদিগের মুখে দুঃখবিষাদের কালিমা চিরকালের জন্য ঢালিয়া দিয়াছে। শিক্ষিত সমাজের প্রাণহীন নিরর্থক চীৎকারে উহাদিগের দুর্ব্বল হৃদয়ে কোন আশা বা আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার হয় না।

দেশের শিক্ষিত লোক ত মুষ্টিমেয়। ইহাদিগের দ্বারা সমগ্রদেশের কি উন্নতি হইবে? বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করিবার জন্য দেশের চারিদিকে কৃষি পরীক্ষালয় (experimental farm) খোলা হইতেছে, মাছের 'চাষ' শিখাইবার আয়োজন চলিতেছে, স্বাস্থ্যসংস্কারের জন্য ম্যালেরিয়া কমিশন প্রভৃতি বসিতেছে, লম্বা লম্বা রিপোর্ট বাহির হইতেছে, কিন্তু চাষীর নিকট ত সে সকলের সংবাদ পৌঁছায় না, সে ঠিক মান্ধাতার

আমলের নিয়মেই এখনও চাষ করে, বড় বড় রিপোর্ট সব থাকবস্তায় জীর্ণ হয়। স্বাস্থ্য-রক্ষা-সমিতির উদ্যোগ সত্ত্বেও গ্রামের চারিদিকে বন জঙ্গল বাড়িয়া চলিতেছে, ডোবাগুলি পানায় ভরাট, কিন্তু অন্যত্র তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জল পাইবার আশা নাই। গাই বলদ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইতেছে, পৃথক করণ (segregation) অসম্ভব। চেষ্টা করিতে যাইলে দেশে মারামারি উপস্থিত হইবে। কাজেই লক্ষ লক্ষ গাই বলদ মরিয়া যায়, অনেকগুলি গ্রাম একসঙ্গে উজাড় হইয়া যায়। আমি নিজে দেখিয়াছি চাষী এবং গোয়ালারা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে থাকে, সে কাঁদার আর বিরাম নাই। দেশ যেমন ছিল প্রায় তেমনি রহিয়াছে, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের শিক্ষালাভে দেশ বেশী জাগে নাই। জন ব্রাইট সত্যই বলিয়াছেন, "the nation lives in the hut." পর্ণকুটিরেই সমগ্র জাতি বাস করে। পর্ণকুটিরবাসী অসংখ্য লোক এখনও ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন, কিন্তু তাহাদিগকে আলোক দিয়া জাগাইতে হইবে এবং তাহার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে।

আমরা যে আলোক পাইয়াছি তাহা আমাদিগের অনুন্নত ভ্রাতৃগণের নিকট পৌছাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বিখ্যাত দার্শনিক এমার্শন বলিয়াছেন, জল, বাতাস, সূর্য্যের আলো প্রভৃতিতে যেমন সকল লোকের সমান অধিকার, বিদ্যালাভেও সকলের সেরূপ অধিকার আছে, সে অধিকার হইতে যদি কেহ বঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে মনুষ্যত্বের অবমাননা হয়। আমাদিগের সমাজে উপযুক্ত শিক্ষাভাব বশতঃ কত লোকের প্রতিভা এবং বুদ্ধিশক্তি বিকাশ লাভ করিতে না পারিয়া নষ্ট হইতেছে তাহা ভাবিলে দুঃখ হয়। ইংলণ্ডের কবি গ্রে গ্রামের গোরস্থানে আসিয়া কাঁদিয়াছিলেন "দারিদ্র্য যে কত লোকের ফুটন্ত প্রতিভা অচিরেই শুকাইয়া দিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই,—এ প্রতিভার খবর জগতের নিকট চিরকালের জন্য গোপন থাকিয়া যায়। সমুদ্রের গর্ভে লুক্কায়িত অন্ধকার গিরিগহ্বরে যে কত উজ্জল রত্ন শোভা পায়, অথবা শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে সৌরভ হারাইয়া কত পুষ্পের জন্ম যে ব্যর্থ হয়, তাহার সন্ধান কে রাখে?" তাই লোকশিক্ষা এত প্রয়োজনীয়, সমাজের যে শ্রেণীর মধ্যে প্রতিভা

থাকুক না কেন, শিক্ষার দ্বারা উহার বিকাশ হওয়া আবশ্যক, যে দরিদ্র সেও যাহাতে আপনার উন্নতি সাধন করিতে পারে, তাহার জন্য অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যক। একারণে আমরা সভ্যজগতের শ্রেষ্ঠ জাতি সমূহের মধ্যেই অবৈতনিক লোকশিক্ষার বিরাট আয়োজন দেখিতে পাই। ইউরোপে আমেরিকায় প্রতিভা খরস্রোতা নদীর মত আপনার পথ খুঁজিয়া লইয়া চলিবেই, কারণ সেখানে উন্নতির সুযোগ আছে, বুদ্ধিশক্তি অনুষ্ঠান অভাবে বিনষ্ট হয় না। ওয়াট্, ষ্টিফেন্‌সন, আর্করাইট এবং হাইন্ সমাজের নিম্নতম স্তর হইতে উঠিয়া জগৎকে তাঁহাদিগের অসামান্য প্রতিভার নিদর্শন দিয়া গিয়াছেন। লিঙ্কন্ গারফিল্ড কাঠের কুটিরে জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশব জীবন যাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু দুইজনেই আমেরিকার যুক্তরাজের সভাপতি হইয়া সুরম্য অট্টালিকায় তাঁহাদিগের শেষজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

বিদেশের দৃষ্টান্ত কেন আমাদিগের সমাজেও সময় বিশেষে সুযোগ লাভ বশতঃ ইতর শ্রেণী হইতে অনেক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। চৈতন্য দেবের ভৃত্য গোবিন্দদাস জাতিতে কামার ছিলেন,

"অস্ত্র হাতা বেড়ি গড়ি জাতিতে কামার।
মাধবী নামেতে হয় জননী আমার॥
আমার নারীর নাম শশীমুখী হয়।
একদিন ঝগড়া করি মোরে কটু কয়॥
নির্গুণ মুরুখ বলে গালি দিল জোরে।
সেই অপমানে গৃহ ছাড়িলাম ভোরে॥"

গৃহ ত্যাগ করিয়া তিনি নবদ্বীপে গিয়াছিলেন, সেখানে চৈতন্য দেবের কৃপায় শিক্ষার সুযোগ পাইয়া তিনি একজন মহাপুরুষ হইয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত কড়চা সরল এবং সুন্দর আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ এবং আমাদিগের পল্লীজীবনে একটি অপূর্ব্ব ভাবুকতা আনিয়া দিয়াছে। চৈতন্যদেবের প্রভাবে শ্যামানন্দ নীচ সদ্গোপ জাতি হইলেও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একজন প্রধান ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এইরূপে একজন

মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহারি শিক্ষায় বাংলাদেশের নিম্নশ্রেণী হইতে যে কত ভক্তের আবির্ভাব হয় তাহার সংখ্যা নাই। আধুনিক কালে কৃষ্ণদাস পাল, মহেন্দ্র লাল সরকার খুব দরিদ্র ঘরে "নিম্নশ্রেণীতে" জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা বিদ্যালাভের সুযোগ পাইয়া শেষজীবনে দেশের শীর্ষ স্থানীয় লোক হইয়াছিলেন। যে সমাজে এই সকল প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি স্বকীয় বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতি করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়, সে সমাজের অবস্থা অতীব শোচনীয়। প্রকৃত পক্ষে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিরই বুদ্ধিশক্তি যাহাতে সম্পূর্ণভাবে স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে, দেশীয় অনুষ্ঠানগুলির সেই উদ্দেশ্য থাকা উচিত। দেশে যদি এই উন্নতির সুযোগ না থাকে, তাহা হইলে মানব-জীবনই বৃথা হইয়া যায়, মনুষ্য এবং পশুর জীবনে কোন প্রভেদ থাকে না। সেক্সপীয়ার বলিয়া ছিলেন,

"What is a man
If his chief good and market of his time
Be but to sleep and feed ? a beast, no more.
Sure he, that made us with such large discourse
Looking before and after, gave us not
That capability and godlike reason
To fust in us unus'd."

বাস্তবিক পক্ষে আধুনিক কালে লোকশিক্ষাই আমাদিগের একমাত্র পরিত্রাণ—জাতীয় উন্নতির একমাত্র সোপান। এই লোকশিক্ষা প্রচার কার্য্যে বাংলাদেশের কতিপয় যুবক এবং ছাত্রগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহাদিগের অধ্যবসায়ে আমি বিশেষ আশান্বিত হইয়াছি। যুবকগণ বাংলাদেশের স্থানে স্থানে অবৈতনিক নৈশবিদ্যালয় খুলিয়া দরিদ্র শ্রমজীবিগণকে আনন্দ এবং উৎসাহের সহিত শিক্ষা দিয়া থাকেন। গ্রন্থকার তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার এই পুস্তকখানি এই নৈশবিদ্যালয় সমূহের শ্রমজীবী ছাত্রগণের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। আশা করি এই সাধু চেষ্টা জয়যুক্ত হইবে।

কলিকাতা

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

———

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

সম্প্রতি বাঙ্গলা দেশে যে সকল নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহাদিগের ছাত্র-গণের উপযোগী করিয়া এই পুস্তকখানি কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে রচিত হইল। নৈশবিদ্যালয় সমূহের প্রত্যেক ছাত্রকেই ইহা বিনা মূল্যে দেওয়া হইবে। সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর যাহারা দিনের শেষে ক্ষণকালের বিরামের জন্য ঘরের দাওয়ায় শীতল ক্রোড়ে আসিয়া শুইয়া পড়ে তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে লইয়া যাওয়াই সুকঠিন। ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবি না দেখাইলে, পুস্তক, শ্লেট অথবা ছবি না দিলে অনেকেই বিদ্যালয়ে আসিতে চাহে না। কারণ, বিদ্যালয়ের নামে দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদিগের মনে কেবল বেত্রাঘাতের বিভীষিকারই উদয় হয়। বস্তুতঃ যাহাদিগের শরীর অবসন্ন তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে আনিয়া নীরস পাঠ মুখস্থ করিতে বলা খঞ্জকে দৌড়াইতে বলার সমান হয়। নৈশবিদ্যালয়গুলিকে সেজন্য তাহাদিগের বিরামলাভের স্থান মনে করিতে হইবে। অশিক্ষিত লোকদিগের কল্পনার মাত্রা খুব বেশী, বালকবালিকাদিগেয় ন্যায় ইহাদিগকেও গল্পের ছলে শিক্ষা দিতে হইবে। এই জন্য এই পুস্তিকাখানির বেশীর ভাগই গল্প,—বিষয়গুলিকে সরস করিবার জন্য অনেক সময়েই কল্পনার আশ্রয় না লইলে চলে না। ঐ কারণে ভাষাও খুব সরল করা হইয়াছে। বর্ণ পরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ নৈশবিদ্যালয় সমূহের ছাত্রগণকে পড়াইয়া তাহার পরে পড়াইবার জন্য একখানি উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব আমরা অনেক দিন হইতে অনুভব করিয়া আসিতেছি। এই পুস্তিকাখানি যদি ইহার স্থান কিয়দংশ পূর্ণ করিতে পারে তাহা হইলে আমাদিগের শ্রম স্বার্থক হইবে।

এখনে শিক্ষার ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইল, পরবর্ত্তী খণ্ড আবশ্যক মত ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

আমরা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি ইহা খুব দুরূহ, কিন্তু দুরূহ হইলেও ইহা অসাধ্য নহে। আমরা যদি এই কার্য্য নিজেরাই না করিতে পারি আশা করি অন্যে আমাদিগকে এই কার্য্য করিবার উপায় বলিয়া দিবেন, অথবা তাঁহারা নিজেরাই ইহা করিবেন। পল্লীগ্রাম সমূহের অবস্থা স্মরণ করিলে হতাশ হইয়া পড়িতে হয়, চারিদিকেই অভাব অথচ তাহা পুরণ করিবার কোন ব্যবস্থাই নাই। অবসাদ ও দুঃখের মধ্যে আশা ও আনন্দের কথা শুনাইতে হইবে, তবেই আমাদিগের রক্ষা, নচেৎ যে সুখের জ্যোৎস্না আমাদিগের ছায়াসুনিবিড় গ্রামগুলির উপর শত শতাব্দী ধরিয়া হাসিতেছে তাহা চিরকালের জন্য ডুবিয়া যাইবে।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয় "গ্রামে" "খেয়াডিঙি" ও "দিদিহারা," তাঁহার রচিত এই তিনটি কবিতা এই পুস্তিকায় প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস্, মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ম্যালেরিয়া নামক প্রবন্ধটি দেখিয়া দিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ মিত্র এম, এ, মহাশয় এই পুস্তিকার ভ্রমসংশোধন করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র মোহন গুপ্ত মহাশয়ের "ম্যালেরিয়া" নামক পুস্তক, খগেন্দ্র বাবুর 'প্রথম শিক্ষা', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস,' ও আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্, এ মহাশয়ের মডারন্ রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ হইতে অনেক উপকার পাইয়াছি। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত এম্, এ, ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র গুপ্ত বি, এ, আমাকে অনেক বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।
১৪ই আশ্বিন, ১৩১৭।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

'শিক্ষা'র দ্বিতীয় সংস্করণ 'শিক্ষা-প্রচার' নামে বাহির হইল। এ সংস্করণে অনেকগুলি নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রমজীবিগণের মধ্যে বর্ণপরিচয় এবং যুক্তাক্ষর পরিচয় সহজসাধ্য করিবারও চেষ্টা হইয়াছে।

শিক্ষা-প্রচারক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্, এ, মহাশয়ের নিকট আমি এই পুস্তিকার বিষয় নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পুস্তকের ছবিগুলি প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত রায় চৌধুরী এম্, এ, মহাশয়ের নিকট আমি 'বৃষ্টি' প্রবন্ধের জন্য বিশেষ ঋণী। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার রচিত 'ধর্ম্মঘট' কবিতাটি পুস্তকে প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া স্থানে স্থানে পুস্তিকার প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। শ্রমজীবিশিক্ষা পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায় ও শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ ভট্ট বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত রাধারমণ মুখোপাধ্যায় বি, এল্‌ও আমাকে অনেক বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ইতি

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।
২৭শে মাঘ ১৩১৯

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

বৈঠকখানা নৈশবিদ্যালয় (কলিকাতা)

India Press, Calcutta.

প্রথম খণ্ড।

কাদাই এবং গোরাবাজার নৈশবিদ্যালয়ের ছুতারের কারখানা।

India Press, Calcutta.

স্বরবর্ণ

অ	আ	ই	ঈ
(অমর)	(আমরা)	(শিশি)	(শীতল)
উ	ঊ	ঋ	ঌ
(কুকুর)	(কূপ)	(কৃপণ)	
এ	ঐ	ও	ঔ
(বেলা)	(বৈকাল)	(মোম)	(মৌমাছি)

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ।

ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন।

প ফ ব ভ ম। য র ল ব শ।

ষ স হ ং ঃ ঁ

ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরবর্ণ যোগ।

অকার যোগ।

বই পড়। কলম ধর। এই কলম বড়। ঐ কলম তত বড় নয়।

* *

আকার যোগ।

মা। বাবা। দাদা। মামা। কাকা।

মা ভাত দাও। থালা কই। এ থালায় খাব না। আমার থালা আন। বড় মাছ চাই। কই মাছ ভাল।

রামায়ণ মহাভারত পড়া ভাল।

ইকার যোগ।

আমরা তিন জন বই পড়ি। যার ভাল তারই জিত। আমার বুঝি হার? নয়ত কি? এবার আমি মন দিয়া পড়িব।

* *

ঈকার যোগ।

আমি আজ মাসীমার বাড়ী যাইব। নদীর তীর দিয়া মাসীমার বাড়ী যাইবার পথ। আমার মাসীমা ধনী। মাসীমার চারিটী

গাড়ী, আর দশ জন দাস দাসী। কাল ভিখারীরা মাসীমার নিকট আসিয়া বলিয়াছিল, "রাণীমা ভিক্ষা দাও, বড় শীত, আমরা গরীব, কাপড় কিনিয়া দাও"। ভিখারীরা কাপড় পাইল।

* *

নাই তীর নাই থল
তরী এক টলমল।

* *

উকার, ঊকার যোগ।

নবীন, তুমি ঐ বকুল ফুলগুলি কুড়াইয়া আন। পূজার সময় নিকট। জবাফুল, কুমুদফুল, তুলসীর পাতা চাই। নদীর দুই কূলই ফুল গাছে ভরা। ভূতনাথ, গরুর দুধ। নূতন কাপড় লইয়া এস। গুরুমহাশয়। গূঢ় কথা। শুক পাখী। শূকর। রুই মাছ। রূপা।

একার, ঐকার যোগ।

যে ভাল লেখাপড়া করে তাহাকে সকলেই ভালবাসে। নৈশ পাঠশালায় বেতন লাগে না। বৈকালবেলায় আমি মাঠে মাঠে বেড়াইতে যাই। চারিদিকে ধানের ক্ষেত। শরতের ধান কেমন হলুদ বরণ। যখন বেলা যায় তখন ফিরিয়া আসি।

বেলা যায় যায়, ধূ ধূ করে মাঠ
দূরে দূরে চরে ধেনু
তরুতল ছায়ে   সকরুণ রবে
বাজে রাখালের বেণু।

* *

রিম্ ঝিম্ ঘন ঘনরে বরষে
গগনে ঘনঘটা শিহরে তরুলতা
ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে।
দিশি দিশি সচকিত দামিনী চমকিত
চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে।

ওকার ঔকার যোগ।

ঘাটের সোপানগুলি পাথরের তৈয়ারী। আমরা সেই সোপানের উপর বসিয়া রোজই নৌকা দেখি। মৌমাছিরা গুণ্ গুণ্ করে, আর নদীর জলের উপর আলো ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠে।

* *

ভোরের পাখী ডাকে কোথায়
ভোরের পাখী ডাকে
ভোর না হতে ভোরের খবর
কেমন করে রাখে।

* * *

শিশু মূর্ত্তি।

India Press, Calcutta.

ঋকার, বিসর্গ, অনুস্বার, চন্দ্রবিন্দু যোগ।

ভিখারীরা বড় দুঃখী। কাহারও ভাল হইলে হিংসা করিও না। ভগবানের কৃপায় তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ভাল লোক হও।

শৃগাল ফাঁদে পড়িয়াছে। চাঁদ উঠিয়াছে।

আষাঢ়।

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে!
বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর,
আউষের ক্ষেত জলে ভরভর,
কালিমাখা মেঘে ও পারে আঁধার
ঘনিয়েছে, দেখ, চাহিরে
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে!
ওই ডাকে শোন ধেনু ঘনঘন,
ধবলীরে আন গোহালে
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে!
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্ দেখি
রাখাল বালক কি জানি কোথায়
সারা দিন আজি খোয়ালে!
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু
পোহালে!

শোন শোন ঐ পারে যাবে বলে'
কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে ?
খেয়া পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজিরে !
পূবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ
ছুকূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদরবেগে জলে পড়ি জল
ছলছল উঠে বাজিরে
খেয়া পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজিরে !
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে গো তোরা
যাস্‌নে ঘরের বাহিরে
আকাশ আঁধার বেলা বেশী আর
নাহিরে !
ঝরঝর ধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল
ওই বেণুবণ ছুলে ঘন ঘন
পথ পাশে দেখ চাহিরে !
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে !

———

সংযুক্ত বর্ণ ।

উদাহরণ

১ম পাঠ ।

সত্যবাদী । মিথ্যা কথা । গত কল্য । হিংস্র পশু । অসৎ সংসর্গ । ব্যাঘ্র ঝম্পন । ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । বিশ্ববিদ্যালয় । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । শঙ্খের শব্দ । গঙ্গার প্রবাহ । মূর্খের লাঞ্ছনা । নবাব সিরাজদ্দৌলা । তৃষ্ণার্ত্ত পথিক । পণ্ডিতের আনন্দ । ভগ্নীর স্নেহ । কুম্ভকর্ণের নিদ্রা । মহম্মদ । পশ্চিম প্রদেশ । শ্মশান কালী । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । রামকৃষ্ণ পরমহংস । পুস্তক পাঠ । স্বামী বিবেকানন্দ । বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । প্রফুল্লচন্দ্র রায় । গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । বুদ্ধ দেব । উষ্ট্রের ধ্বনি । লক্ষ্মীর বরপুত্র । ঊর্দ্ধবাহু । পরকে কেন মন্দ কই, নিজের মতন নিজেই নই ।

২য় পাঠ।

প্রতিজ্ঞা।

মোরা সত্যের পরে মন
আজি করিব সমর্পণ
জয় জয় সত্যের জয়।
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য
খুঁজিব সত্য ধন,
জয় জয় সত্যের জয়।
যদি দুঃখে দহিতে হয়
তবু মিথ্যা চিন্তা নয়!
যদি দৈন্য বহিতে হয়
তবু মিথ্যা কর্ম্ম নয়!
যদি দণ্ড সহিতে হয়
তবু মিথ্যা বাক্য নয়!
জয় জয় সত্যের জয়!
মোরা মঙ্গল কাজে প্রাণ
আজি করিব সকলে দান!
জয় জয় মঙ্গলময়!

মোরা লভিব পুণ্য শোভিব পুণ্যে
গাহিব পুণ্য গান !
জয় জয় মঙ্গলময় !
যদি দুঃখে দহিতে হয়
তবু অশুভ চিন্তা নয় ।
যদি দৈন্য বহিতে হয়
তবু অশুভ কৰ্ম্ম নয়
যদি দণ্ড সহিতে হয়
তবু অশুভ বাক্য নয়
জয় জয় মঙ্গলময় !

———

৩য় পাঠ।

শিবের দক্ষালয় যাত্রা।

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্, ভভম্ভম্, শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টল্ টল কল কল তরঙ্গা॥
ফণাফণ ফণাফণ ফণীফণ্ণ গাজে।
দিনেশ-প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধ্বক্ধ্বক্ ধ্বক্ধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে॥
দলন্মল দলন্মল গলে মুণ্ডমালা।
কটী কট্ট সদ্যোমরা হস্তিছালা॥
পচ্যচর্ম্মঝুলী করে লোল ঝুলে।
মহাঘোর আভা পিণাকে ত্রিশূলে॥
ধিয়া তা ধিয়া তা ধিয়া ভূত নাচে।
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে॥
সহস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা।
হুহুঙ্কার হাঁকে উড়ে সর্পবাণা॥

চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী॥
চলে ডাকিণী যোগিণী ঘোর বেশে।
চলে শাখিণী প্রেতিণী মুক্ত কেশে॥
গিয়া দক্ষ-যজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে।
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে॥
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দেরে সতীরে॥
ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে

———

৪র্থ পাঠ।

জননী।

নমো নমঃ জননী
অশেষ-গুণ-ধারিণী
নিত্য সরসা চিত্ত হরষা
রৌদ্র কণক-বরণী।
শস্য-শ্যামলা কুন্দ ধবলা
অম্বু মেখলা-ধরণী॥
নিত্য-নবীনা চিত্ত দ্রাবিণা
সপ্তস্বর-সুভাষিণী।
তুঙ্গ-হৃদয়া দিক্‌-বলয়া
স্নিগ্ধ-মলয়া-শ্বাসিনী॥
দীপ্তি-প্রোজ্জ্বলা চন্দ্র কুণ্ডলা
অব্জ-বিলোল-লোকনী।
স্রোত মধুরা, নীর-ক্ষীর-ধারা
সন্তাপ-জরা-নাশিনী॥
জ্যোৎস্না-মধুর-হাসিনী।
পল্লী-শোভনা, মল্লী-ভরণা
দ্রুম-চামর-ধারিণী।

লোক-বন্দিতা দেব-বন্দিতা
জ্ঞান-বিজ্ঞান-বাদিনী ।
লক্ষ-প্রসূতা, মোক্ষ-জ্ঞানদা
অযুত-সুত-শালিনী ॥
কৃত্য-কুশলা, চিত্ত-বহুলা
চিত্ত-বেদন-হারিণী
জয় দে, জয় দায়িনী ;
নমো নমঃ জননী ।

মাণিকতলা নৈশবিদ্যালয় (কলিকাতা)

India Press, Calcutta.

দ্বিতীয় খণ্ড।

রামচন্দ্র ও চণ্ডালকন্যা শবরী।

অনেক দিনের কথা। তখনও রাম পঞ্চবটী বনে যান নাই। সেই সময়ে ঐ বনের কাছেই একজন চাঁড়ালের মেয়ে বাস করিত। তাঁহার নাম শবরী। শবরী মনে করিত যে, যে রকম করিয়াই হউক না কেন, ঐ বনে যে সব ঋষিরা থাকেন তাঁহাদের সে সেবা করিবে। শবরী চাঁড়ালের মেয়ে, সে ত আর ঋষিদিগকে ছুঁইতে পারিবে না, তাই সে তাঁহাদের পা ছুঁইয়া প্রণাম করিতে পাইত না। সে তাঁহাদের মনে মনে পূজা করিত, ইহাতেই সে সুখ অনুভব করিত। ঋষিরা যখন স্নানে যাইতেন, পথের কাঁটা কাঁকর যাহাতে তাঁহাদের পায়ে না লাগে সেইজন্য সে রোজ তাঁহাদের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিত। ঋষিরা কখন স্নানে যাইতেন জান? খুব ভোরে। বেশ একটি ভোরের বেলা মনে কর। সূর্য্য উঠে নাই, সব চুপচাপ্, দুই একটা পাখী কেবল ডাকিতেছে, বনের ভিতর যে সব গাছ আছে তাহাদের ফাঁকে ফাঁকে তখনও একটু একটু আঁধার রহিয়াছে। খুব সরু পথ বনের ভিতর দিয়া বাঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, পথের ধারের গাছ-গুলি সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে, আঁধারে একটা গাছকে আর

একটা গাছ হইতে চেনা যাইতেছে না। ঠিক এইরূপ সময়ে ঋষিরা রোজ উঠে স্নান করিতেন। রোজই যখন তাঁহারা ঐ পথ দিয়া স্নানে যাইতেন তখন দেখিতেন কে যেন তাঁহাদের পথ বেশ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছে, আবার স্নান শেষ করিয়া যখন হোমের জন্য কাঠ আনিতে যাইতেন, তখন দেখিতেন কে যেন তাঁহাদের জন্যই কাঠ রাখিয়াছে। কে এমন করিয়া রাখিত তাহা তাঁহারা কিছুতেই ঠিক করিতে পারিতেন না। একদিন দয়ালু এক ঋষি ভাবিলেন, বোধ হয়, কোন ভক্ত আমাদের সেবা করিবার জন্য গোপনে গোপনে এই সব করিতেছে। এই মনে করিয়া পথের পাশে লুকাইয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, একজন মেয়ে ঝাঁটা হাতে পথ পরিষ্কার করিয়া পরে বনের ভিতর হইতে কাঠ কুড়াইয়া আনিল। তখন ঋষি বলিলেন, "বাছা তুমি কে ?" ঋষির কথা শুনিয়া শবরীর খুব ভয় আর লজ্জা হইল। ঋষি বলিলেন, "ভয় করিতেছ কেন, তুমি ত কোন অন্যায় কর নাই, বরং আমাদের উপকারই করিয়াছ।" শবরী তখন বলিল "আমি চাঁড়ালের মেয়ে, আমার বাপ মা কেহই নাই, আপনাদের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছি, আমি আর আপনাদের কি উপকার করিব ? আমি চাঁড়ালের মেয়ে,---গোপনে গোপনে পথ পরিষ্কার করি, কেন না পাছে জানিতে পারিয়া, যদি আপনারা সে পথে না যান।" ঋষি বলিলেন, "বাছা, তুমি যে-সে চাঁড়ালের মেয়ে নও,

তুমি জাতিতে চাঁড়াল হইলেও তোমার মনের ভিতর ঋষিদের ভাব আছে, আমি তোমাকে এমন এক জিনিষ দিব যাহাতে তোমার আর কোন অভাবই থাকিবে না।” শবরী বলিল “আমি ত আপনাদের নিকট হইতে টাকা পাইব মনে করিয়া এ কাজ করি নাই।” ঋষি বলিলেন “টাকা নয়, আমি তোমাকে ভগবানের নাম দিব।” শবরী নাম পাইয়া খুব সুখী হইল। অন্য ঋষিরা একথা শুনিয়া খুব রাগিয়া গেলেন, আর ঐ ঋষিকে একঘরে করিয়া রাখিলেন। এই সব গোলযোগ দেখিয়া ঋষি ঐ জায়গা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবেন মনে করিলেন। যাইবার আগে তিনি শবরীকে ডাকিয়া বলিলেন “শবরি! আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব, তুমি এখানে তপস্যা কর, তোমার মনের অভিলাষ পূর্ণ হইবে।” শবরী সেখানে একটা কুঁড়ে ঘরে থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিল।

একদিন ঋষিরা স্নান করিতে নদীর তীরে যাইয়া শবরীকে বলিলেন, “পাপীয়সি! তুই এই নদীতে স্নান করিস্?” শবরী বলিল “আমি না বুঝিয়া অপরাধ করিয়াছি, আর এমন কাজ করিব না।” লোকে বলে শবরীকে যখন ঋষিরা এইরূপ অপমান করিতেছিলেন তখন না কি নদীর জল লাল হইয়া উঠিয়াছিল। সেখানে শবরী ফলমূল খাইয়া তপস্যা করিতে লাগিল; গুরু বলিয়াছেন, তাহার ইষ্টদেব আসিবেন, সুতরাং তাঁহার জন্য ভাল

ফলমূল বাছিয়া বাছিয়া নিজে না খাইয়া রাখিতে লাগিল। কোন পাখী যখন সেই বনের ভিতর খুব মধুর গান গাহিত, সে বলিত "পাখি! এখন তুই যা, যখন আমার ইষ্টদেব আসিবেন তখন তাঁহাকে তোর গান শুনাতে আসিস্।" এইরকম কঠোর তপস্যা করিয়া শবরী দিন কাটাইত, কিন্তু ইষ্টদেব ত আর আসিলেন না। ঠিক এই সময়ে রাম সীতাকে খুঁজিতে খুঁজিতে পম্পা সরোবরের নিকট আসিলেন। রামকে দেখিয়া শবরী অধীর হইয়া পড়িল। ইষ্টদেব আসিয়াছেন, শবরী ইষ্টদেব ছাড়া মনে মনে আর ত কিছুই চাহে নাই। তাঁহার জন্য যে ভাল ভাল ফল রাখিয়া দিয়াছিল, অনেকগুলি এখন শুকাইয়া গিয়াছে, কতকগুলির আবার খানিকটা খাইয়া সে রাখিয়া দিয়াছিল—সে সেই সব ফল আনিয়া তাঁহাকে দিতে লাগিল। রাম ফল খাইয়া বলিলেন, "শবরি, তোমার এ ফল খুব ভাল, কৌশল্যা যাহা দিতেন তাহার চেয়েও ভাল।" সে সময়ে শবরী পাগল হইয়া পাখীদিগকে বলিতে লাগিল। "পাখি, এখন তোরা আয়, এখন তোরা ডাক্।" শবরী কি করিবে ঠিক পায় না, সাম্‌নে যাহা দেখে, তাহাই দিতে চায়। রাম ও লক্ষ্মণ শবরীর এই ভাব দেখিয়া ত অবাক্। রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন "দেখ ভাই, এই যে শবরীর প্রেম, ইহাই যথার্থ প্রেম!" শবরীকে বলিলেন "শবরি! তোমার কি বর চাই।" শবরী বলিল "আমার ভক্তি

হউক, এই বর দিন।” রাম বলিলেন “শবরি! তুমি আবার ভক্তি চাও? তোমার যে ভক্তি এ দেবতাদের চেয়েও বেশী।” শবরী তখন বলিল “তবে আর আমি কিছুই চাই না, আমাকে পুড়িয়ে ফেলুন।” শবরী পুড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। ঋষিরা আর দেবতারা শবরীর নাম গান করিতে লাগিলেন। রাম নদীর জল লাল হওয়ার কথা শুনিয়া বলিলেন “ঋষিগণ! তোমরা জ্ঞান লাভ করিয়াছ বটে, কিন্তু ভক্তি কাহাকে বলে জান না। শবরী নীচকুলে জন্মিয়াছে সত্য, কিন্তু সে প্রকৃত ভক্তি লাভ করিয়াছে।”

ম্যালেরিয়া।

স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় থাক্‌লে যে ম্যালেরিয়া হয়, ইহা অনেকেই মনে করে; কিন্তু মশার কামড় যে ম্যালেরিয়া রোগের প্রধান কারণ ইহা অনেকের নিকট নূতন বোধ হইবে। তবে নূতন হলেও ইহাই ঠিক। মশাগুলা ভারী নেমক হারাম। মানুষ তাহাদিগকে রক্ত দিয়া পোষে; তাহারা মানুষের ভাল করা দূরে থাকুক্ তাহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্যই যেন উপকার চাহে। সব মশাই যে নেমকহারাম তাহা নহে ভাল মানুষ মশাও আছে। কিন্তু ম্যালেরিয়া মশাকে ভাল মানুষ মশা হইতে বেশ চিনিয়া

লইতে পারা যায়। ম্যালেরিয়া মশাগুলা খাল, বিল, ডোবা, ধানের ক্ষেতে ডিম পাড়ে। ম্যালেরিয়া মশার পাখায় ছিটা ছিটা দাগ আছে, আর ইহারা ভূমিতে লম্বা ভাবে বসে, কুঁজো হয় না। দিনের বেলায় ইহারা ঘরের কোণে, চৌকির তলায়, গোয়ালে, ঝোঁপে বা যে কোন অন্ধকার জায়গায় লুকাইয়া থাকে। আঁধার হইলেই ঝাঁকে ঝাঁকে তাহারা বাহির হয় আবার সকাল হইলেই পলাইয়া যায়। কাজেই রাত্রিকালেই ম্যালেরিয়া রোগে পড়িবার ভয়।

জলবায়ু ম্যালেরিয়া রোগের কারণ নহে ইহা ২৫ বছর আগে একজন বিখ্যাত ডাক্তার প্রথম বুঝাইয়া দেন। যে জায়গায় খুব ম্যালেরিয়া হইতেছে সেখানে বেশ লোহার জাল দিয়া ঘেরাঘোরা বাড়ীতে বাস করিলে, আমাদিগের ম্যালেরিয়া রোগে পড়িবার ভয় থাকিবে না। মশাগুলি যখন ম্যালেরিয়ার রোগীকে কামড়ায় তখন সেই রোগীর রক্তে ম্যালেরিয়ার যে বীজ থাকে তাহাও শুষিয়া লয়, রক্তটাকে সে হজম করে। ম্যালেরিয়ার বীজটা তাহার মুখের হুলের কাছে এসে জমা থাকে। পরে যখন সেই মশা কোনও সুস্থ লোককে কামড়ায় তখন ঐ বীজ সেই লোকটির রক্তে মিশাইয়া তাহার জ্বর আনিয়া দেয়। যেটাকে আমরা বীজ বলিলাম সেটা একরকম অতি ক্ষুদ্র জীব বা জীবাণু। এই জীবাণুগুলা এত ছোট যে ইহাদিগকে খালি

চোখে দেখা যায় না। তেজাল আতসী কাঁচ দিয়া আমরা এগুলিকে দেখিতে পাই। মশা যখন কামড়ায় তখন এই জীবাণুগুলি রোগীর দেহে ঢুকে, আর রক্তের ভিতর কেঁচোর মত নড়া চড়া করে। দুই এক দিনের মধ্যেই ইহাদের বংশ খুব বাড়িয়া যায়, তখন রোগী ক্রমশঃ অবশ হইয়া পড়ে।

মশার কামড়ই যখন ম্যালেরিয়া রোগের কারণ দেখা গেল, তখন যে জায়গায় ম্যালেরিয়া মশা বেশী জন্মে সেইখানে ম্যালেরিয়া বেশী হয়, ইহা বেশ বুঝা যায়। এঁটেল মাটীর দেশে বর্ষার জল সহজে জমে, মাটীর ভিতর প্রবেশ করে না। কাজেই জমি স্যাঁত স্যাঁতে হয়, চারধারে খাল, বিল, ডোবায় জল জমে। আর যতদিন খাল কি নালা কাটিয়া জল নিকাষ না করা হয় ততদিন ম্যালেরিয়ার মশা খুব বাড়িতে থাকে। জল নিকাষ করিয়া দেওয়া, খাল বিল ডোবা ভরাইয়া দেওয়া, জলা জায়গার উপর কেরোসিন তেল ঢালা—এই সকল উপায়ে মশা মারিয়া ফেলা ম্যালেরিয়া দমনের উপায়—আজকাল চিকিৎসকেরা ইহা ই মনে করেন।

মশা স্থির জলে ডিম পাড়ে, সেই ডিম ফুটিয়া জলের পোকা হয়; সেই পোকা বড় হইয়া মশা হয়; অতএব ঘরের আশে পাশে মশা জন্মিবার জায়গা যাহাতে না থাকে তাহা করা উচিত। ঘরের কাছে খানা, পানাপুকুর, ডোবা থাকিলে তাহাদিগকে

ভরাট করিয়া দিতে হইবে। যে সকল ডোবা ভরাট করিবার উপায় নাই তাহাতে কেরোসিন তেল ঢালিয়া দিলে সেখানকার মশা মরিয়া যাইবে। উঠানে গরুর ডাবা যেন না থাকে, হাত পা ধোয়ার অথবা বাসন মাজার জন্য উঠানে যাহাতে কাদা না থাকে তাহা দেখা উচিত। ঘরের পাশে ভাঙা হাঁড়ি, টিনের ক্যানেস্তারা, নারিকেলের মালা, ফুল গাছের টব, গামলা প্রভৃতি জলের আধার যাহাতে না থাকে তাহাও দেখিতে হইবে। আমরা যদি একটু সাবধান হই তাহা হইলে এই সকল উপায়ে কিছুমাত্র টাকা খরচ না করিয়াও মশার কামড় হইতে নিজ-দিগকে অনেকটা রক্ষা করিতে পারি। শুইবার ঘরের কাছে কোন প্রকার ফসলের ক্ষেত ও গোয়ালঘর না থাকা ভাল, শুইবার ঘরে কাপড়ের আলনা, বাক্স, তরিতরকারী, গুড় অথবা ঘিয়ের হাঁড়ি রাখিতে নাই। রাত্রে খালি গায়ে কখনো থাকিবে না এবং খালি গায়ে এক দণ্ডের জন্যও ঘরের দাওয়ায় বসা বা বনের পাশ দিয়া যাওয়া আসা উচিত নহে। সকলেরই মশারী ব্যবহার করা উচিত, গরীব লোকদিগের কাপড় বা চাদর মুড়ি দিয়া ঘুমান উচিত। ধূপ ধূণা জ্বালিলে মশার কামড় হইতে কতকটা রক্ষা পাওয়া যায় ইহা ছাড়া আর যে সকল ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় আছে সেগুলি কিছু ব্যয় সাপেক্ষ। পাড়ার লোকেরা যদি মিলিত হইয়া সাধারণ তহবিলে কিছু কিছু করিয়া চাঁদা

(যেমন বারোয়ারীর চাঁদা, বিবাহাদি উৎসবে চাঁদা) দেন এবং সেই চাঁদা যদি জল নিকাষের জন্য খাল কাটিয়া দেওয়া, বিল ভরাট করিয়া দেওয়া, নদী ও জলাশয়ের গতি ঠিক করিয়া দেওয়া, মাঝে মাঝে বনজঙ্গল বা পুকুরের গাছ গাছড়া সাফ করিয়া দেওয়া—এই সকল কাজে ব্যয়িত হয় তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যেই পাড়াটী ম্যালেরিয়াশূন্য হইবে—ইহাতে ভুল নাই। হংকংএ জল নিকাষের জন্য নালা কাটিয়া দিবার আগে ১২৯৪ জন রোগী ছিল, তাহার পর ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা কমিয়া গিয়া ৪১৯ জন হয়।

সাল	ম্যালেরিয়া রোগী
১৯০১	১২৯৪
১৯০৫	৪১৯

পৃথিবী ও আকাশ।

আচ্ছা, আমরা যদি যে কোন দিকেই হউক না কেন সোজা চলিয়া যাই, তাহা হইলে শেষে কোথায় গিয়া পৌঁছাইব? প্রথমে মনে হয়, এই যে মাথার উপর মস্ত বড় গোল ছাদের মত আকাশ আছে, সেটা কিছু দূরেই মাটীর সঙ্গে

মিশিয়াছে, তার ওধারে আর যাওয়া যায় না। এটা যে ভুল, তাহা বেশ সহজেই দেখান যাইতে পারে। কেননা যদি আমরা কিছুদূর যাই, তাহা হইলে আকাশ যেখানে মাটীর সঙ্গে মিশিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে সেটা আগেও যতদূরে ছিল এখনও তত-দূরে আছে বলিয়া বোধ হইবে। আসল কথা এই যে মাথার উপর আমরা যে ছাদের মত দেখিতে পাই, সেটা ও রকম কিছুই নয়, শুধুই শূন্য।

তাহা হইলে আমরা শেষ পর্য্যন্ত গিয়া কোথায় পৌঁছাইব? মনে কর, মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম, নদী, পুকুর পার হইয়া আমরা একবারে সোজা চলিয়াছি। যদি খুব একটা মস্ত বড় উঁচু পাহাড়ের কাছে গিয়া পৌঁছাই, পাহাড় কোন রকমে পার হইয়া সোজা চলিব। যদি সমুদ্রের তীরে গিয়া পৌঁছাই তাহা হইলে জাহাজে করিয়া সমুদ্রের উপর দিয়া সোজা চলিয়া যাইব। শেষে কোথায় গিয়া পৌঁছাইব?

আমি বলি শোন। শেষে যেখান হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম ঠিক সেইখানেই ফিরিয়া আসিব।

কেমন হইল জান? এই মনে কর একটা গোল কুমড়ার উপর যদি একটা পিঁপড়ে বরাবর সোজা চলিতে থাকে তাহা হইলে শেষ কালে পিঁপড়েটা যেখান হইতে যাত্রা করিয়াছিল, ঠিক সেইখানেই আসিয়া পৌঁছাইবে। আমাদের পৃথিবীও কুমড়ার মত

গোল, একটা মস্ত বড় কুমড়া। কত বড় জান? যদি আমরা রোজ দশ ক্রোশ করে পথ চলিতে থাকি, আর বরাবর সোজা চলি, তাহা হইলে যেখান হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, সাড়ে তিন বৎসরের পরে ঠিক আমরা সেইখানে ফিরিয়া আসিব। অনেক লোক এমনি করিয়া পৃথিবী ঘুরিয়া আসিয়াছে।

আর এই যে ছাদের মত আকাশ দেখিতে পাই, সেটা পৃথিবীর চারিদিকেই আছে। গোল পৃথিবী, তাহার চারিদিকেই আকাশ।

আমরা যদি পাখীর মত উপরে উড়ি, তাহা হইলে অনেকটা উপরে উঠিলে, খুব শীত বোধ হইবে। তিন ক্রোশের বেশী আর উঠা যাইবে না, এত ঠাণ্ডা। উপরে ২৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত হাওয়া আছে। তার পরে আর হাওয়াও নাই। ইহার পরে সব শূন্য এবং সেই শূন্যের আর শেষ নাই।

আর ঐ যে সূর্য্য দেখি, রোজ সকালে উঠে আর সন্ধ্যাবেলায় ডুবিয়া যায়, ওই সূর্য্য একটি আগুনের গোলা। সূর্য্য পৃথিবীর চেয়ে দশলক্ষ গুণ বড়। অনেক দূরে আছে বলিয়া এত ছোট দেখায়।

আর এক কথা শুন। আমাদের পৃথিবী সর্ব্বদাই সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। এবং সবটা ঘুরিয়া আসিতে ঠিক তার এক বৎসর লাগে। কিন্তু পৃথিবী কি রকমে ঘুরে জান?

কুমড়া মাটীর উপর গড়াইয়া দিলে যেমন পাক খাইতে খাইতে যায়, পৃথিবীও ঠিক তেমনি সূর্য্যের চারিদিকে শূন্যের মধ্য দিয়া পাক খাইতে খাইতে ঘুরিতেছে। ভাব দেখি কি আশ্চর্য্য! যেমন সূর্য্যের চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আসিতে পৃথিবীর এক বৎসর লাগে, তেমনি একবার ঘুরপাক্ খাইতে ঠিক তাহার এক দিনরাত্রি অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা লাগে। এইরূপে ঘুরপাক্ খাইয়া পৃথিবীর যে দিকটায় আমরা আছি, সেই দিকটা যখন সূর্য্যের সামনে আসে, তখন আমরা সূর্য্যকে দেখিতে পাই, তখন আমাদের দিন হয়। আবার যখন আমরা সূর্য্যের উল্টা দিকে যাই, তখন আমাদের দিকে রাত্রি হয়, আর উল্টাদিকে, যে দিকটা সূর্য্যের সামনে গিয়া পড়ে—দিন হয়। কেমন, বুঝিতে পারিয়াছ।

সূর্য্যের চারিধারে যে শুধু আমাদের পৃথিবী একলা ঘুরিতেছে তাহা নয়, পৃথিবীর মত আরও অনেকগুলি বস্তু ঘুরিতেছে। তাহাদিগকে গ্রহ বলে। তাহাদের মধ্যে কেহ পৃথিবীর চেয়ে দু-চার গুণ বড়, কেহ আবার ছোট। এখান হইতে তাহাদিগকে বড় বড় নক্ষত্রের মত দেখায়। তাহাদের মধ্যে একটাকে চেনা খুব সোজা। সেটাকে আমরা শুকতারা বলি। বছরের মধ্যে ছয় মাস সেটা ভোর বেলা উঠে, আর ছয় মাস সন্ধ্যা বেলা উঠে।

চাঁদ আমাদের পৃথিবীর চেয়ে ছোট; সে কিন্তু পৃথিবীর চারদিকেই সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সূর্য্যের চারিদিকে নয়।

নক্ষত্র।
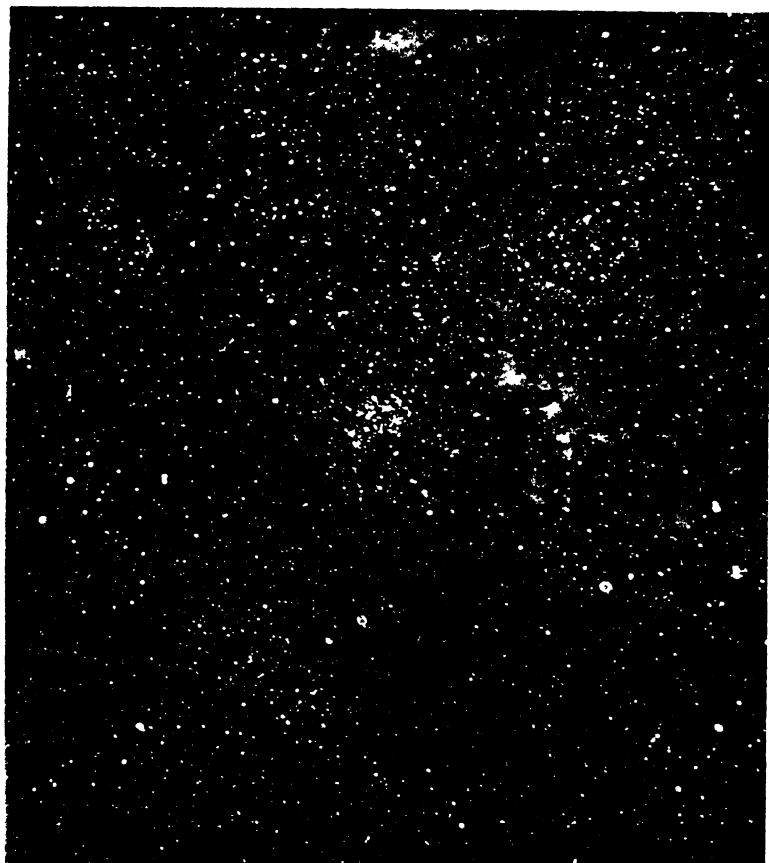
India Press, Calcutta

এই আমাদের সূর্য্য আর আটটা পৃথিবী লইয়া একটা দল হইল। এই রকম হাজার হাজার দল আছে। প্রত্যেক তারা লইয়াই এই রকম এক একটী দল আছে।

এখন ভাব দেখি জগৎ কত বড় আর মানুষ কত ছোট! আবার যিনি এই জগৎ তৈয়ার করিয়াছেন তিনি কত বড় এবং তাঁহার কত শক্তি!

বৃক্ষেরপ্রাণ।

তোমরা অনেকেই হয়ত জান না যে বৃক্ষেরও ঠিক আমাদিগের মত প্রাণ আছে। জীব মাত্রেই যেমন জীবন ধারণ করিবার জন্য আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে, বৃক্ষও সেইরূপ প্রাণ ধারণ করিবার জন্য খাদ্য গ্রহণ করে। এই খাদ্য বৃক্ষেরা পত্রের সাহায্যে বায়ু হইতে এবং শিকড়ের সাহায্যে মাটী হইতে সংগ্রহ করে। মাটী যদি খুব কঠিন হয় তাহা হইলে বৃক্ষের শিকড় উহার নীচে প্রবেশ করিতে পারে না, এই কারণে, যাহাতে বৃক্ষের সরু সরু এবং কোমল শিকড় গুলি মাটীর খুব নীচে চলিয়া যাইয়া চারিদিকে লতাইয়া বৃক্ষের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে তাহার সুবিধা করিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কৃষকেরা শস্য যাহাতে উৎপন্ন

হইতে পারে তাহার জন্য কঠিন মাটিকে কর্ষণ করিয়া আল্‌গা করিয়া দেয়। কঠিণ মাটি যত আল্‌গা হয় ততই ছিদ্রের সংখ্যা এবং মাটির জল শোণষ এবং ধারণ করিবার শক্তি বাড়ে। বৃষ্টি অথবা জলসেচনের দ্বারা ভূমি ভিজিয়া গেলে সলিতা যেরূপে তৈল শোষণ করিয়া লয় গাছের শিকড়গুলি সেরূপে রস শোষণ করে। মাটি হইতে যে সকল খাদ্য বৃক্ষের প্রয়োজনীয় তাহা ঐ রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া ডালপালার এবং পাতার পুষ্টি সাধন করে।

আমরা যেমন শ্বাস লই বৃক্ষের পত্রগুলিও সেইরূপ করে, শ্বাস গ্রহণ করিবার সময়ে তাহারা বৃক্ষের খাদ্যের অবিশিষ্ট অংশ বায়ু হইতে সংগ্রহ করে। প্রাণীর মত বৃক্ষ যে কেবল-মাত্র খাদ্য সংগ্রহ করে তাহা নহে, জীবের যে প্রধান লক্ষণ—আঘাত অনুভব করা—তাহা ইহাতেও দেখা যায়। আমাদিগকে যদি কেহ আঘাত করে তাহা হইলে আমরা চীৎকার করিয়া থাকি। জীব যখন কোন বাহিরের শক্তির দ্বারা আহত হয় তখন সে নানা-রূপে তাহার সাড়া দিয়া থাকে। গাছেরও এই প্রকার সাড়া দিবার শক্তি আছে। আমাদিগের দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় গাছের এই প্রকার সাড়া বিবিধ যন্ত্রের সাহায্যে মাপিয়া লইতে পারিয়াছেন। গাছকে সূচ দিয়া বিদ্ধ করিলে, অথবা পোড়াইয়া দিলে গাছ যে ঐ আঘাত অনুভব করে

তাহা তিনি যন্ত্রের দ্বারা স্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছেন। লজ্জাবতী লতা যেমন পাতা নাড়িয়া সাড়া দেয়, সেইরূপ সকল গাছই আঘাত পাইলে তাহা অনুভব করিয়া সাড়া দিয়া থাকে, কিন্তু যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন লজ্জাবতী লতা ছাড়া অপর বৃক্ষের সাড়া ধরা যায় না। বন চাঁড়াল গাছের পত্রগুলি আপনাপনি নৃত্য করে, লোকের বিশ্বাস যে হাতের তুড়ি দিলেই নৃত্য আরম্ভ হয়, কিন্তু তাহা নহে। বনচাঁড়ালের নৃত্যের সহিত জীবের হৃদয়স্পন্দনের সম্বন্ধ আছে, তুড়ির কোন সম্বন্ধ নাই। মানুষ এবং অন্যান্য জীবের হৃদয় যেমন আপনাপনি স্পন্দিত হয়, সাধারণ বৃক্ষেরও এইরূপ স্পন্দন যন্ত্রের যাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক বৃক্ষ এবং সাধারণ জীব এই সকল কারণে প্রায়ই সমান। মানুষের মত বৃক্ষেরাও আঘাত অনুভব করে, কিন্তু মানুষ যেমন আঘাত পাইলে চীৎকার করিয়া সকলকেই তাহা জানায় এবং আঘাত প্রতিরোধ করে, বৃক্ষ তাহা করিতে পারে না। তরুলতার যে অনুভব শক্তি আছে, তাহাদিগের জীবন মানুষের জীবনের যে ছায়া,—তরুলতার সহিত মানুষের এই জীবনগত আত্মীয়তার কথা অধ্যাপক বসু মহাশয় স্পষ্ট ভাষায় জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিয়া আমাদিগের দেশকে উজ্জ্বল করিয়াছেন।

বৃষ্টি।

টুপ্ টুপ্ টুপ্—সারাদিন আকাশ থেকে জল পড়িতেছে, মনে হইতেছে বুঝি আকাশের গায়ে ঝাঁঝরার মত হাজার হাজার ছিদ্র হইয়া গিয়াছে আর তাই দিয়া আকাশের ওপাশের অনেকদিনের জমানো জলের ধারা পড়িতেছে। যে দিকে দেখি জল থই থই করিতেছে, পথ ঘাট ক্ষেত পাথার সব জলে ভরিয়া গিয়াছে। মাঠের জল নালা বহিয়া ডোবা পুকুরে গিয়া পড়িতেছে, ডোবার জল নদীতে গিয়া পড়িতেছে, নদীর জল একটানা বহিয়া চলিয়াছে। এত যে বৃষ্টি, তার মধ্যেও ছেলেদের বিশ্রাম নাই, কেউ ছাতা কেউ গামছা মাথায় দিয়া, কেউ বা খালি মাথাতেই ভিজিতে ভিজিতে নালার ধারে মাছ ধরিবার জন্য জড় হইয়াছে, আর খানিকক্ষণ এই ভাবে বৃষ্টি হইলে বুঝি পৃথিবী ভাসিয়া যাইবে। সকাল থেকে অবিরত টুপ্ টুপ্ টুপ্ জল পড়িতেছে।

আচ্ছা, এত যে জল—এ কোথা হইতে আসিতেছে? আকাশের উপর হইতে জল পড়িতেছে বলিয়া মনে হয় বটে, আর মেঘগুলি যেন ভাঙ্গা কলসীর ফুটোতে কাদার চাপা দিয়া জল বন্ধ করিবার মত আকাশের গায়ে লাগিয়া বৃষ্টি থামাইবার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। আকাশ ত আর একটা টিন বা ইটের ছাতের মত নয়, আর তার উপরে ত আর

জলের ফোয়ারাও নাই; সত্যই আকাশটা কিছুই নয়, কেবল শূন্য। যেমন অল্প একটু জল সাদা দেখায়, কিন্তু সমুদ্রের জলরাশি একসঙ্গে নীল দেখায়, তেমনি উপরের বাতাস অনেকদূর পর্য্যন্ত আছে বলিয়া একসঙ্গে আমাদের কাছে নীল দেখায়। আকাশ একটা নীল রঙ্গের কোন জিনিস নয়। ঐ যে পাত্‌লা পাত্‌লা মেঘগুলি, ঐ গুলিই বৃষ্টির কারণ। কথা নাই বার্ত্তা নাই, দিব্যি সকালে সূর্য্যের আলোতে চারিদিক হাসিতেছিল, লোকেরা কেহ মাঠে, কেহ বাজারে নানাকাজে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল এমন সময় মেঘ দেখা দিল, দেখিতে দেখিতে সারা আকাশ মেঘে ছাইয়া গেল, মুহূর্ত্ত মধ্যে ঝম্ ঝম্ করিয়া তীরের মত বৃষ্টির ধারা পড়িতে লাগিল, সারাদিন তার বিরাম নাই। বিনা মেঘে কখনই বৃষ্টি হয় না, সুতরাং মেঘই বৃষ্টির কারণ। এখন দেখা যাউক মেঘ আসে কোথা হইতে।

সরিষা পিষিলে যেমন তেল পাওয়া যায়, আবার খইলও পড়িয়া থাকে, মেঘের বেলা কিন্তু তেমন নয়। জল ঝরিয়া গেলে মেঘ থাকে না, মেঘ জল ভিন্ন আর কিছুই নয়। জল বাষ্পের আকারে মেঘ হয় ও আকাশে ভাসে।

একটা হাঁড়িতে জল গরম করিতে থাকিলে খানিক পরে সোঁ সোঁ শব্দ হয়, আর ধোঁয়ার মত বাষ্প উঠে। সেই বাষ্পে কোন ঠাণ্ডা জিনিস ধরিলে ঐ জিনিসের গায়ে ফোটা ফোটা জল দেখা

যায়। বৃষ্টির বেলাও এইরূপ। প্রথম জল থেকে বাষ্প হয়, তারপর ঐ বাষ্প আবার জল হইয়া যায়, একটা ছোট হাঁড়িতে অল্প একটু বাষ্প হয়, তাহাতে ত আর দেশময় বৃষ্টি হইতে পারে না; আকাশ জোড়া জলপাত্র ও প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড চাই।

সূর্য্য হইতেছে সেই প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড, আর সমুদ্রের অগাধ জল হইতে গরম হইয়া উঠিতেছে এই আকাশছাওয়া মেঘ বা বাষ্প। অবশ্য সূর্য্য যে ঠিক আগুণ দিয়াই তৈয়ারী তাহা না হইতে পারে, তবে সেটা খুব গরম একটা জিনিস আর তারই উত্তাপে জল বাষ্প হইয়া উঠে। পৃথিবীতে যত নদী পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় আছে সব থেকেই সূর্য্যের তাপে জল গরম হইয়া বাষ্প উঠিতেছে, তার মধ্যে সমুদ্রই সব চেয়ে বড় বলিয়া সেখান থেকেই. বাষ্প বা মেঘ খুব বেশী জন্মে। ধরিতে গেলে সব মেঘই সমুদ্র থেকে উঠে। সেই মেঘগুলি বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া বেড়ায়। মেঘ যে বাতাসের সঙ্গে চলে তাহা একটু লক্ষ্য করিলেই বেশ বুঝা যায়। আর এটাও দেখা যায় যে উপরে বেশী বাতাস থাকিলে বৃষ্টি হয় না, মেঘগুলি উড়িয়া অন্যস্থানে যায়।

ছোট হাঁড়ির বেলায় নীচে আগুন দিয়া জলকে বাষ্প করিতে হয়, সমুদ্রের বিশাল জলরাশির বেলা ত আর তা' হয় না। সেখানে উপর থেকে সূর্য্যের তেজে বাষ্প হয়। মোটের উপর উপযুক্ত রূপ

উত্তাপ পাইলে যে জল বাষ্প্ হয় তাহা দুই স্থানেই ঠিক্, তবে সে উত্তাপ উপর হইতেই আসুক্ আর নীচ হইতেই আসুক।

জলীয় বাষ্প আবার ঠাণ্ডা পাইলেই তরল হইয়া জল হয়। মেঘও বৃষ্টি হয় এই কারণেই।

সমুদ্রের খানিকটা জল ত মেঘ হইয়া আকাশে ভাসিতে লাগিল বাতাসের গতি অনুসারে নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িল, কেউবা পাত্‌লা বাতাসের সঙ্গে উপরে উঠিতে লাগিল। এইরূপে বেড়াইতে বেড়াইতে মেঘগুলি যখন কোন উঁচু পর্ব্বতের ঠাণ্ডাগায়ে লাগে বা উপরের ঠাণ্ডা হাওয়ার সংস্পর্শে আসে তখনই মেঘ গলিয়া জল হয়, সেই জলই আবার পৃথিবীতে পড়ে। জল আবার বেশী ঠাণ্ডা হইলে জমিয়া বরফ হয়, সেই জন্য সময় সময় উপর হইতে জল পড়িবার সময় যদি খুব বেশী ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে দিয়া পড়ে তাহা হইলে পথের মাঝে জমিয়া বরফ বা শিলারূপে পৃথিবীতে পড়ে। কত গাছপালা ভাঙ্গিয়া যায়, ছোট ছোট ধান বা পাট প্রভৃতির গাছগুলি নষ্ট হইয়া যায় কত লোকের মাথা ফাটে, আরও কত অনিষ্ট হয়।

ইহার কারণ কতকটা বুঝা গেল; এখন এই যে জল আসে তাহা যায় কোথায়, আর সর্ব্বদা এইরূপে জল বাষ্প হইয়া গেলে সমুদ্রেরও ত শুখাইয়া যাইবার কথা। একটু লক্ষ করিলেই ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে।

আমরা দেখিয়াছি পথে ঘাটে মাঠে যত জল জমিয়াছে তাহার কতকটা নদীতে গিয়া পড়িতেছে। নদী কোন না কোন প্রণালীতে শেষে স্থমুদ্রেতে গিয়া পড়ে, স্থতরাং এই জলের একভাগ এইরূপে সমুদ্রে গেল। তারপর রৌদ্র উঠিলেই পথ ঘাটের জল কাদা শুকাইয়া যায়। তার কারণ এই যে রৌদ্রের গরমে সেই সব জল বাষ্প হইয়া যায়। সে বাষ্প আবার পরে জল হইয়া পড়িতে পারে। আর খানিকটা জল মাটিতে বসিয়া যায়। এই অংশ মাটির মধ্যকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া হয় নদীতে, নয় কূপে নয় জলাশয়ে গিয়া জমা হয়। মাটি খুঁড়িলে যে জল পাওয়া যায় সে এই জল। মোটের উপর এক ফোঁটা জলও নষ্ট হয় না, আর সমুদ্র হইতে যাহা আসে তাহা প্রায় সবই সমুদ্রে গিয়া পড়ে। স্থতরাং সমুদ্রের শুকাইয়া যাইবার ভয় নাই।

জল না হইলে আমাদের চলে না, তবে বেশী জলও যে ভাল তাহা নয়। ভগবান্ একই জলকে সমুদ্র হইতে আকাশপথে পাহাড়ে সমতলে, আবার পাহাড় সমতল হইতে সমুদ্রে পাঠাইয়া কেমন স্থন্দর ভাবে পৃথিবী রক্ষা করিতেছেন। ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, ভক্তিতে মস্তক অবনত হয়।

———

শিক্ষা।

একজন লোকের এক আদুরে ছেলে ছিল। বাপ ছেলেকে লেখাপড়া শেখায় নাই, বয়স হ'লে সে ঠিক গরুর মত বোকা হ'ল। বাপ ম'রে গেলে তা'র বিয়ে হ'লে কিছুদিন পরে একটা ছেলেও হ'ল। নিজে যদিও সে লেখাপড়া শেখেনি, কিন্তু ছেলেটির যা'তে বেশ ভাল লেখাপড়া হয় তা' সে কর্‌ল। ছেলেটি সব বিদ্যাই শিখ্‌ল, তার নাম যশ চারিদিকেই ছড়িয়ে পড়্‌ল। দেশের রাজা খুব ভাল, তিনি বিদ্বান্ লোককে ভাল বাসেন। তা'র নাম শুনে রাজা তা'কে একদিন সভায় ডেকে পাঠালেন, আর বল্‌লেন, 'দেখ, আমি তোমাকে আমার সভায় রাখ্‌তে চাই; বাড়ীতে তোমার আর কে কে আছেন?' ছেলেটি বল্‌ল "বাড়ীতে আমার বাবা আছেন তিনি ছাড়া আমার আপনার লোক আর কেউ নেই।" রাজা ছেলেটিকে তাঁর বাপকে সভায় আন্‌তে বল্‌লেন, আর তাঁ'র সহিত কথা বল্‌বেন এ ও জানালেন। বাপ ভারী বোকা, সে রাজার সঙ্গে কথা বল্‌তে পারবে কেন? রাজা রেগে বল্‌লেন, "এমন বিদ্বান্ ছেলে, কিন্তু বাপটা কি বোকা! ছেলে বলে উঠ্‌ল, "ছেলে বিদ্বান, বাপও বিদ্বান, কিন্তু ঠাকুরদাই বোকা"। রাজা বল্‌লেন "কেন ঠাকুরদা বোকা হবেন কি করে?" ছেলে বল্‌ল, "বাপ বিদ্বান—কেন না

তিনি আমাকে বিদ্যা শিখিয়েছিলেন। সেই জন্যই আজ আমি আপনার নিকট বিদ্বান্ ব'লে পরিচিত ; ঠাকুরদা বোকা কারণ বাবা যেমন আমাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তিনি তেমনি তো আমার বাবাকে শিক্ষা দেন নাই।" রাজা এই কথায় খুব খুসী হ'য়ে বল্‌লেন "আজ হ'তে তুমি আমার সভা পণ্ডিত হ'লে। তোমার বাপের ভরণপোষণের জন্য তোমাকে আর কিছুই ভাব্‌তে হ'বে না।" ছেলে এখন একজন খুব বড় পণ্ডিত, রাজ-সমাদরে তার সুখে দিন কাটে,—ছেলেরও সুখ, তার মূর্খ বাপেরও সুখ।

রাজা ও শাসন।

আমরা যে দেশে থাকি তাহার নাম বাংলা দেশ ; বাংলা দেশের মত আরও কতকগুলি দেশ লইয়া ভারতবর্ষ হইয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষ যে কত বড় তাহা তোমরা সহজেই বুঝিতে পার,—এই জন্য ভারতবর্ষকে মহাদেশ বলা যাইতে পারে। তোমাদিগের গ্রামে কত লোক বাস করে ? মনে কর হাজার লোক। এই রকম অনেক গ্রাম সহর লইয়া বাংলা দেশ। বাংলা দেশে প্রায় দশ কোটি লোকের বাস। ভারতবর্ষ-মহাদেশে কত লোকের বাস জান ? প্রায় ত্রিশ কোটি লোকের। কত হাজারে ত্রিশ কোটি ? হিসাব করিয়া দেখ।

লোকের মধ্যে ভাল মন্দ আছে। ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে যে সব লোকই ভাল এ কথা কখনও বলা যায় না। অনেক লোক ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেকের আবার চুরি ডাকাতিই ব্যবসা। তবে কি করিয়া আমরা এত লোক এক সঙ্গে বেশ মিলে মিশে সুখে দিন কাটাইতেছি, তাহা তোমরা কি কেহ বলিতে পার? দেশের মধ্যে যদিও চোর ডাকাত আছে তবু তাহারা রোজ রোজই চুরি ডাকাতি করিতে সাহস পায় না। কেন সাহস পায়না জান? চোর ধরিবার আর তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য উপযুক্ত লোক আছে বলিয়াই। মানুষ মারিলে রাজার বিচারে ফাঁসি কাঠে ঝুলিতে হইবে এই ভয়ে চোর মানুষ মারে না। আইন না মানিলে শাস্তি পাইতে হইবে, এই বুঝিয়া সকলেই আইন মানে। আইন কর্ত্তা ও দেশের শান্তিরক্ষককে আমরা সাধারণতঃ রাজা বলিয়া থাকি। আমাদিগের রাজার নাম জর্জ্জ, তিনি বিলাতে থাকেন। রাজা হইলেই যে তাঁহাকে একলাই রাজ্য শাসন করিতে হইবে এমন নহে। রাজার অনেক কর্ম্মচারী থাকে, তাহারা তাঁহার কাজ করে। আমাদিগের দেশে চৌকীদার হইতে বড়লাট পর্য্যন্ত রাজকর্ম্মচারী, সেই জন্য রাজা বিদেশে থাকিলেও আমাদিগের দেশে বেশ শান্তিরক্ষা হইতেছে।

কিছু দিন হইল আমাদিগের রাজা এদেশে আসিয়াছিলেন। দিল্লীতে তিনি দরবার করিয়া এদেশের লোকদিগের পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে খুব ভালবাসেন, কলিকাতায়

আসিয়া তিনি তাঁহার দরিদ্র প্রজাবর্গের উন্নতি কল্পে গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের যে আশ্বাসবাণী প্রচার করিয়াছেন তাহা আমরা কখনও ভুলিব না।

তোমরা গ্রামে সকলেই রাত্রে চৌকীদারের ডাক শুনিয়াছ। চৌকীদারেরা পাহারা দেয় বলিয়া গ্রামে চুরি ডাকাতি বেশী হইতে পারে না। গ্রামে চুরি ডাকাতি অথবা মারামারি হইলে চৌকীদার ইহার কথা থানার দারোগাকে বলিয়া আসে। দারোগা খবর পাইয়া গ্রামে নিজে আসিয়া উপস্থিত হন, অথবা জমাদার কি ছোট দারোগাকে পাঠাইয়া দেন। চুরি ডাকাতি মারামারি প্রভৃতির বিচার প্রথমে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি জেলার প্রধান সহরে থাকেন, তিনিই জেলার হর্ত্তা কর্ত্তা। জেলার প্রধান সহরে জজও থাকেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের ফৌজদারী আদালতে যেমন মারামারি চুরি ডাকাতি প্রভৃতির বিচার হয়, জজের দেওয়ানী আদালতে সেইরূপ জমি ও স্বত্ব সংক্রান্ত যাবতীয় মোকদ্দমার বিচার হয়। দেওয়ানী আদালতেও সেইরূপ মুনসিফ সবজজেরা জজের অধীন। ইহারা ছোট ছোট মামলা বিচার করেন। কলিকাতা সহরে যে সর্ব্ব-প্রধান বিচারালয় আছে সেখানে বাংলা দেশের ফৌজদারী ও দেওয়ানী সংক্রান্ত সকল মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনারের অধীন। ম্যাজিষ্ট্রেট যেমন একটি জেলার কর্ত্তা, কমিশনার সেইরূপ কতকগুলি জেলার কর্ত্তা। ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর যেমন কমিশনার সেইরূপ কমিশনারের উপরে আবার গভর্ণর। বাংলাদেশের যেমন গভর্ণর সেইরূপ বেহার, পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এক এক জন ছোটলাট আছেন।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লাটদিগের উপর একজন সর্ব্বময় কর্ত্তা আছেন, তিনিই বড়লাট। তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমাদিগের রাজা বিলাতে থাকেন। আমাদিগের দেশ যাহাতে ভাল করিয়া শাসিত হয় সেইজন্য তিনি বড়লাটকে বিলাত হইতে এখানে পাঁচ বৎসরের জন্য পাঠাইয়া দেন। বড়লাট তাঁহার কার্য্যের জন্য রাজার নিকট দায়ী থাকেন। বড়লাটের কয়েকজন মন্ত্রী আছেন—তাঁহাদিগের সাহায্যে বড়লাট আইন কানুন তৈয়ারী এবং দেশের শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করেন। এখনকার বড়লাটের নাম লর্ড হার্ডিঞ্জ।

প্রাচীন বাংলাদেশের কথা।

তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বাংলার রাজকুমার বিজয় সিংহের সিংহল বিজয়ের কথা বলিয়াছি। সিংহলের ইতিহাস পড়িলে ইঁহার সম্বন্ধে অনেক জানা যায়। উহাই বাংলা দেশের প্রথম প্রামাণিক বিবরণ।

বিজয় সিংহ বংলার রাজা সিংহবাহুর পুত্র, তিনি সাতশত সঙ্গী লইয়া সিংহপুর হইতে জাহাজে চড়িয়া লঙ্কায় যান এবং লঙ্কা জয় করেন। বিজয় সিংহের বংশধরগণ লঙ্কায় অনেক বৎসর রাজত্ব করেন। বিজয় সিংহ বুদ্ধের জন্মের কিছু পূর্ব্বেই সিংহল গিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের দেহ ত্যাগের পর মহারাজ অশোক যখন মগধ (বেহার) হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন তখন বাংলা দেশের অনেক লোক বৌদ্ধ হইয়াছিল। চীন দেশের লোকেরাও বৌদ্ধ হইল, কয়েক জন চীন পর্য্যটক ভারতবর্ষে আসিলেন। চীন পরিব্রাজক হিউ-এন-সিয়াং বাংলা দেশ দেখিতে আসিয়াছিলেন, তিনি এখানে সেই সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েরই মঠ ও দেবমন্দির দেখিয়া গিয়াছিলেন। বাংলা দেশে তখন অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজা ছিল। সময়ে সময়ে তাহারা মগধের অধীন হইত। মগধের রাজা পাল বংশীয়েরা বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা যখন বাংলা দেশ জয় করিলেন, তখন হিন্দু ধর্ম্ম লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। লোকেরা বৈদিক উপাসনা প্রণালী ভুলিয়া গেল, কাজেই যখন হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী মহারাজ আদিশূর পরে বাংলা দেশের রাজা হইলেন তিনি কনোজ হইতে পাঁচ জন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া বাংলার হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার পরে সেনবংশীয় হিন্দু রাজগণের সময়ে হিন্দু ধর্ম্মের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। সেন রাজারা শৈব ছিলেন, তাঁহাদিগের সময় শৈবদিগের প্রভাব খুব বাড়িয়াছিল,

বুদ্ধদেব।

India Press, Caclutta.

বাংলার প্রত্যেক হিন্দু গৃহে এখনও যে নিত্য শিবপূজা চলিয়া আসিতেছে ইহা সেই শৈব প্রভাবের চিহ্ন।

রাজা বল্লাল সেন প্রথম বয়সে একজন শৈব ছিলেন, পরে শাক্ত হইয়া তিনি প্রাচীন হিন্দু তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইলেন, কাযেই প্রজারাও শাক্ত হইয়া বৌদ্ধ তান্ত্রিকদিগের মত ত্যাগ করিয়া হিন্দু তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম মানিতে লাগিল। যে যে সমাজ তাঁহার তান্ত্রিক ধর্ম্ম অনুমোদন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে লইয়া তিনি নূতন সমাজ গঠন করিয়াছিলেন। যাঁহারা তান্ত্রিক ধর্ম্মানুরক্ত, বিদ্বান ও কুলাচারী ছিলেন তাঁহাদিগকে তিনি সমাজে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছিলেন। ইঁহারাই প্রথমে কুলীন বলিয়া তাঁহার সভায় পূজিত হইলেন, এবং পরে বাংলার শাক্ত সমাজের মন্ত্রগুরু হইয়াছিলেন। শৈবধর্ম্ম। জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। সাধারণে উচ্চতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, কাজেই বিপদে আপদে নিত্যত্রানকর্ত্রী দেবীর প্রভাব তাহাদিগের মধ্যে আধিপত্য লাভ করিল। বাংলা দেশে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবের সহিত শীতলার পূজা প্রচলিত হইল, অনেক কবি শীতলা মঙ্গলা রচনা করিলেন। এই সকল মঙ্গল ডোম পণ্ডিতেরা শীতলার পূজা সময়ে এখন পর্য্যন্তও গান করিয়া থাকেন। মনসা বিষহরী, তিনি বিষ হরণ করেন, তাঁহার পূজা করিলে সর্পভয় থাকে না। মনসা পূজা আরম্ভ হইল, অনেক কবি বিষহরীর গান বা মনসা মঙ্গল রচনা করিলেন,

তাঁহারা চাঁদ সদাগরের ইষ্টদেবের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও বেহুলা সতীর যেরূপ পতিভক্তির ছবি দিয়াছেন, জগতের অন্য কোন ভাষায় এরূপ দেখা যায় কি না সন্দেহ। এখনও মনসাদেবী বাংলার হিন্দু গৃহ মাত্রেই পূজা পাইয়া থাকেন, পূজা শেষ হইলে মনসার কথা হিন্দুস্ত্রীগণ এখনও ভক্তি ভাবে শুনিয়া থাকেন। আজও হিন্দু স্ত্রীরা সকল শুভ কার্য্যে শুভচণ্ডী অথবা সুবচনীর পূজা দিয়া যে সুবচনীর কথা কহিয়া থাকেন তাহাও এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। এইসময় হইতে বাংলা দেশে মঙ্গল চণ্ডীর পূজাও আরম্ভ হয়। অনেক কবি মঙ্গলচণ্ডীর গান রচনা করিলেন। চণ্ডী কবির মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁহার নাম কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম। কিন্তু কবিকঙ্কনের চণ্ডিগানের পূর্ব্বেই বাংলার জনসাধারণের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। বাংলায় বৈষ্ণব প্রভাবের সূত্রপাত বহু পূর্ব্বেই হইয়াছিল। বল্লালসেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র লক্ষণসেন রাজা হইয়াছিলেন, লক্ষণসেন সাধারণ তান্ত্রিকদিগের কদাচার বর্জ্জনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং বৃদ্ধ বয়সে গোঁড়া বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দ শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইত। জয়দেবের সুধাময় গানে তখন বাংলাদেশ প্লাবিত হইল। অনেক লোক বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, কিন্তু ইহার ফল বিপরীত হইল। রাজধানী বিলাসিতা ও স্বেচ্ছাচারিতার স্রোতে ভাসিয়া গেল। উহারই পরিণাম ফলে

লক্ষণসেনের নবদ্বীপ রাজধানী মুসলমান সেনাপতির হস্তগত হইল। কথিত আছে, মুসলমান সেনাপতি খুব অল্পসংখ্যক অশ্বারোহী লইয়া নবদ্বীপ আক্রমণ করিয়াছিলেন, বিলাসী সৈন্যগণ তাঁহার গতিরোধ করিতে অসমর্থ হইল। লক্ষণসেনের সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ মুসলমানের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যপুরাণের দোহাই দিয়া রটনা করিল যে, দীর্ঘশ্মশ্রু, আজানুলম্বিতভুজ মুসলমান শীঘ্র আসিয়া নবদ্বীপ অধিকার করিবে। লক্ষণসেন ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদের খিড়কীর দ্বার দিয়া পলায়ণ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। বাংলার স্বাধীনতা চিরকালের জন্য চলিয়া গেল। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম, যাহার ফল প্রথমে এত বিষময় হইয়াছিল, তাহা প্রকৃতপক্ষে সেই সময়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। জনসাধারণের মধ্যে চৈতন্যের আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত শাক্ত ধর্ম্মের প্রভাব বিশেষ পরিমাণে ছিল। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কোমল পদাবলীতে জনসাধারণের হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার করিতে পারে নাই।

মুসলমানেরা ভারতবর্ষের সম্রাট হইয়া দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন করিলেন। সেনাপতি বক্‌তিয়ার বাংলাদেশ জয় করিলে দিল্লীশ্বর বাংলার সম্রাট হইলেন, কিন্তু যদিও বাংলার নবাবগণ, তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিতেন, কার্য্যে তাঁহারা প্রায় স্বাধীন ছিলেন। বাংলাদেশে তখন তিনটি রাজধানী ছিল, লক্ষণাবতী অথবা গৌড়, সুবর্ণগ্রাম অথবা ঢাকা এবং সপ্তগ্রাম বা ত্রিবেণী। যতদিন মুসল-

মান নবাবগণ দিল্লীর সম্রাটের অধীন ছিলেন, ততদিন হিন্দুদিগকে অনেক নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু যখন তাঁহারা দিল্লীশ্বরকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন হইলেন, তখন হইতেই বাঙ্গালী-হিন্দুদিগের সাহায্য তাঁহাদিগের পক্ষে আবশ্যক হইয়া পড়িল। সহদেব নামে একজন হিন্দু সেনাপতি ইলিয়াসের পক্ষ হইয়া দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিলেন। মুসলমান নবাবেরা হিন্দুবীরগণকে উপাধি দান করিতে লাগিলেন, মুসলমান রাজসরকারে বিচক্ষণ হিন্দুরা উচ্চ পদ লাভ করিলে, হিন্দু সমাজকে আয়ত্তাধীনে আনিবার জন্য মুসলমান নবাবেরা সমাজনেতা ব্রাহ্মণদিগকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিলেন। হিন্দু মুসলমানে মেশামেশি আরম্ভ হইল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেরা মুসলমানী রীতিনীতি অভ্যাস করিতে লাগিলেন, হিন্দু সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। হিন্দু মুসলমানের ঘনিষ্টতার ফলে হিন্দু জমিদার রাজা গণেশ মুসলমান নবাবের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া পড়িলেন, পরে হিন্দুরাজমন্ত্রীর পরামর্শে তাঁহাকে বিনাশ করিয়া বাংলার রাজা হইলেন। তাঁহার বংশধরগণ ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অনেক বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পর মুসলমানেরা আবার রাজা হইল, মুসলমান অত্যাচার পুনরায় আরম্ভ হইল, ক্রমে চরমসীমায় উঠিল, অনেক হিন্দু দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন, অনেকে মুসলমান হইল, যে নবদ্বীপ তখন ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজনেতাদিগের ধর্ম্মচর্চ্চার শ্রেষ্ঠ স্থান, সেখানেও

রাজভয় উপস্থিত হইল। তাহার পর হোসেন সাহ নবাব হইলেন, মহাপ্রভু চৈতন্যের আবির্ভাব হইল, মুসলমান অত্যাচার মহাপ্রভুর উদার ধর্ম্মের স্রোতে ভাসিয়া গেল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে প্রেমের পুর্ণমূর্ত্তি চৈতণ্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। মুসলমান অত্যাচারে বিলীনপ্রায় হিন্দু ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল, মদ্যমাংস দ্বারা তান্ত্রিক উপাসনা তখন ভক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার প্রাদুর্ভাব অনেকাংশে কমিয়া গেল, বাংলা ও উড়িষ্যার হিন্দুসমাজ হরিনামে মাতোয়ারা হইয়া গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে হরিনাম কীর্ত্তনকরিতে লাগিল। শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্য ও নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর সহযোগী হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। অনেক মুসলমানও বৈষ্ণব হইল, ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠবর্ণের মধ্যে যদিও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রথমে তত আধিপত্য লাভ করিতে পারে নাই, তত্রাচ শীঘ্রই ইহা বাঙ্গালীর জনসাধারণের ধর্ম্ম হইয়া পড়িল। নবাব হোসেন সাহের মন্ত্রী রূপ ও সনাতন গোস্বামী হইতে দীন দরিদ্র পর্য্যন্ত হরিনামে মত্ত হইল। বহুসংখ্যক পদাবলী রচিত হইল, পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে অনেকে মুসলমান ছিলেন। অনেক স্ত্রীকবিও সেই সময়ে পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, এই সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় চরিত সাহিত্যেরও সূত্রপাত হইল। চৈত্যন্যদেবের আদর্শ হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যে জীবন-চরিত লেখার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচিত হইল ইহার

পূর্ব্বে দেবদেবীর চরিত্র ভিন্ন আর কোন চরিতগ্রন্থ রচিত হয় নাই। বৈষ্ণবেরা সংস্কৃত চর্চ্চা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। রূপগোস্বামি-কৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং সনাতন বিরচিত হরিভক্তিবিলাসটীকা সংস্কৃত সাহিত্যের খুব উজ্জ্বল রত্ন।

ধর্ম্মান্দোলনে বাংলার সমাজে যে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া-ছিল এক্ষণে তাহার সংস্কার আরম্ভ হইল। এই সময়ে কাশীধামে কুল্লুক মনুসংহিতার টীকা প্রণয়ন করিয়া স্মৃতিশাস্ত্রের আদর বাড়াইয়াছিলেন। সমাজবন্ধন কার্য্য আরম্ভ হইল। বাংলার শ্রেষ্ঠ জাতি মাত্রেই এই সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী হওয়াতে মহাপ্রভুর ধর্ম্মপ্রচার কিঞ্চিৎ হীনবল হইয়া পড়িল। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতি হিন্দুসমাজে পবিত্রতা আনিয়াদিল। বাংলার ধর্ম্মকর্ম্ম আজিও তাঁহার ব্যবস্থানুসারেই চলিতেছে। রঘুনন্দনের কিছু পূর্ব্বে দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মেলবন্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বেই উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী বারেন্দ্র কুলীনগণকে আটটি শাখায় বা পটীতে বিভক্ত করেন। দেবীবরের সমসাময়িক পুরন্দর বসু দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের মধ্যে সমান পর্য্যায়ে বিবাহ দিবার নিয়ম প্রচলিত করেন, এবং রাজা পরমানন্দ রায় বঙ্গজ কায়স্থদিগের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। রঘুনন্দনের স্মৃতি ব্যবস্থায় বিশুদ্ধ শক্তিপূজাও দিন দিন প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সমস্ত তন্ত্রের সার

সঙ্কলন করিয়া শক্তিপূজার সুব্যবস্থা করিলেন। শক্তিপূজা আবার জাগিয়া উঠিল। ঘরে ঘরে হরিনামের সহিত চণ্ডীর নামগান আবার শুনা গেল। জ্যোৎস্নাস্নাত নীরব রজনীতে যখন একই সময়ে রামায়ণ বা মহাভারত পাঠ এবং হরিনামকীর্ত্তন অথবা চণ্ডীগানের গুন্ গুন্ শব্দ মলয় বাতাসে মিশিয়া যাইত, সে সুখের সময় মনে পড়িলে কাহার হৃদয় না উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আন্দোলনে যখন বাংলাদেশ আলোড়িত হইতেছিল, সেই সময়ে বাংলাদেশের একজন পণ্ডিতের উজ্জ্বল প্রতিভা সমগ্র ভারতবর্ষকে আলোকিত করিয়া তুলিল। নবদ্বীপ হইতে একজন নবীন যুবক মিথিলায় আসিয়া সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রকে পরাজিত করিলেন। এই নবীন যুবকের নাম রঘুনাথ। রঘুনাথ মহাপ্রভু চৈতন্যের ও রঘুনন্দনের সহপাঠী। ইহাঁদিগের গুরুর নাম বাসুদেব সার্ব্বভৌম। এমন ভাগ্যবান্ অধ্যাপক কে আছেন যাঁহার এমন তিন জন ছাত্র! রঘুনাথ নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া নব্য ন্যায় প্রবর্ত্তন করিলেন। রঘুনাথের প্রবর্ত্তিত ন্যায়শাস্ত্র আজও পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে আদৃত হইতেছে, আজও পর্য্যন্ত সুদূর দক্ষিণাত্য হইতে অনেক ছাত্র বাংলার ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য নবদ্বীপে আসিতেছেন।

তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বাংলাদেশ কেবলমাত্র যে ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য ও দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের আন্দোলনে আলোড়িত

হইয়াছিল তাহা নহে। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাদেশ কৃষি বাণিজ্যেও মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে এদেশে ইউরোপের অধিবাসীগণ ব্যবসা করিবার জন্য আসিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদিগের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, আমাদিগের দেশে তখন এত অধিক পরিমাণে শস্য, মাংস, চিনি, আদা ও তূলা জন্মিত যে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে সেরূপ পাওয়া যাইত না। চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রাম ও সোণার গাঁ প্রভৃতি তখন বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। এই সকল স্থান হইতে প্রতি বৎসর অনেক জাহাজ কার্পাস, রেশম, মসলিন, আদা, লঙ্কা, চাউল, গম, চিনি প্রভৃতি দ্রব্যে বোঝাই হইয়া ইউরোপ প্রভৃতি দেশে গমন করিত।

কৃষি ও বাণিজ্যে অর্থ লাভ করিয়া বাঙ্গালীরা তখন আনন্দে জীবন যাপন করিত, তখন প্রতি গ্রাম হইতে কীর্ত্তন, রামায়ণ ও চণ্ডীর গান নিস্তব্ধ রজনীর নিস্তব্ধতা দূর করিত, তখন ঘরে ঘরে মহোৎসব হইত, নারীগণের শঙ্খ এবং হুলুধ্বনিতে প্রত্যেক গৃহ মুখরিত হইত।

"আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজ্জনে।
ছাগ মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে ॥
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা।
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা ॥
মাংস না লয় কেহ করিয়া আদরে।
দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে ॥"

আবার কবে আমাদের গ্রামগুলি আগেকার মত সুজলা সুফলা হইবে, কবে আমরা ঐ আম্রকুঞ্জ ঘেরা সুশীতল ঘাটে, ঐ শ্যামল প্রান্তরে বসিয়া শরীর জুড়াইব এবং অনুভব করিব "কেমন শীতল বাতাস, কেমন স্বচ্ছ নির্ম্মল জল। এ জল বাতাস, স্বাস্থ্য আনিয়া দিবে, দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া মহামারীর সংবাদ আনিবে না।"

পল্লীগ্রামে।

ঐ যে গাঁটি যাচ্চে দেখা 'আইরি' * ক্ষেতের আড়ে—
প্রান্তটি যার আঁধার-করা সবুজ কেয়াঝাড়ে,
পূবের দিকে আম-কাঁঠালের বাগান দিয়ে ঘেরা
জট্‌লা করে যাহার তলে রাখাল বালকেরা—
ঐটি আমার গ্রাম, আমার স্বর্গপুরী
তাই ত আমার মনটি সেথায় গেছে চুরি।

বাঁশবাগানের পাশটি দিয়ে পাড়ার পথটি বাঁকা,
পথের ধারে গলাগলি সজ্‌নে গাছের শাখা,
গরুর গাড়ীর চাকায় পথে শুকায়নাক কাদা,
কোথাও বা তার বেড়ার পাশে ঘুঁটেছায়ের গাদা;
সৃষ্টিছাড়া এমনি আমার স্বর্গপুরী,
তবু আমার মনটি সেথায় গেছে চুরি!

---

* আইরি—অড়র।

যত দেশের যত পাখী ঐ গাঁয়ে কি আছে !
ঝোপে-ঝাপে বেড়ায় উড়ে' বাসার কাছে কাছে ;
পথের পাশে গাছের ডগা নুইয়ে পড়ে গায়ে,
চল্‌তে গেলেই শুক্‌নো পাতা গুঁড়োয় পায়ে-পায়ে ;
সৃষ্টিছাড়া এমনি আমার স্বর্গপুরী,
তবু আমার মনটি সেথায় গেছে চুরি !

পদ্মদীঘি কোথায় পাব—পদ্ম নাইক মোটে,
চৈৎ-বোশেখে শুকিয়ে উঠে, জলটুকু না জোটে !
পানায় মরা ডোবায় ভরা, সিদ্ধি গাছে ছাওয়া,
ভাঁটুপিঠিলির জঙ্গলেতে হাঁপিয়ে বেড়ায় হাওয়া—
সৃষ্টিছাড়া এমনি আমার স্বর্গপুরী,
তবু আমার মনটি সেথায় গেছে চুরি !

পাঠশালাটিও নাইক গাঁয়ে—নাইক সে ডাকঘর,
কোথায় বদ্দি, যদিও কম্‌তি নয়ক বড় জ্বর ;
রাজার প্রাসাদ নাইক সেথা, ধনীর দেবালয়,
সজ্জাহীনের লজ্জা নাইক, দারিদ্র্যে নাই ভয় ;
সৃষ্টিছাড়া এমনি আমার স্বর্গপুরী,
তবু আমার মনটি সেথায় গেছে চুরি !

তবু উঠে কুমার-পাড়ায় কদমতলার ধারে।
সঙ্কীর্ত্তনের মিলন-গীতি সান্ধ্য অন্ধকারে,
সবাই যেন স্বাধীন সুখী, বাধা-বাঁধন-হারা—
আবাদ করে বিবাদ করে সুবাদ করে তারা ;
ঐটি আমার গ্রাম, আমার স্বর্গপুরী,
তবু আমার মনটি সেথায় গেছে চুরি !

শোভা বলো, স্বাস্থ্য বলো আছে বা না আছে,
বুকটি তবু নেচে ওঠে এলে গাঁয়ের কাছে ;
ঐ খানেতে সকল শান্তি, আমার সকল সুখ—
বাপের স্নেহ, মায়ের আদর, খোকার হাসিমুখ ;
ঐটি আমার গ্রাম, আমার স্বর্গপুরী,
তাইত আমার মনটি সেথায় গেছে চুরি !

দেশের কৃষি ও সমবায়-সমিতি।

বাংলাদেশের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত এবং দক্ষিণে সমুদ্র। ইহার নিম্নভাগ পূর্ব্বে সমুদ্রগর্ভে ছিল। সমুদ্র পশ্চাতে সরিয়া যাওয়ায় বৎসর পর বৎসর চর উঠিয়া ক্রমে উপবন, গ্রাম, এবং অবশেষে নগর সৃষ্ট হইয়াছে। উত্তরের পর্ব্বত-প্রদেশ হইতে নির্গত

হইয়া অনেকগুলি নদী বাংলাদেশের উপর দিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র এই নদীগুলির মধ্যে প্রধান। ইহারাই বাংলাদেশের সমৃদ্ধির প্রধান কারণ। নদীর জলে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র সুদূর হিমালয় পর্ব্বত-প্রদেশের মৃত্তিকা ধৌত করিয়া আনিয়া নিম্নবঙ্গের সমতল প্রান্তরের উপর ঢালিয়া দিয়াছে। ঐ মৃত্তিকাস্তর বৎসর পর বৎসর সঞ্চিত হইয়া উচ্চভূমিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। উহার উর্ব্বরতা শক্তি এত অধিক যে ঐ স্থানে বিনা সারে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিভিন্ন শস্য উৎপন্ন হয়। কখনও বা বন্যা আসিলে তীরবর্ত্তী গ্রাম এবং কৃষিক্ষেত্র জলমগ্ন হয়; ভূমির উপর পলি পড়ে। ঐ পলিও জমির পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। অনেক সময়ে নদী হইতে খাল কাটিয়া নানাস্থানে কৃষিকার্য্যের সুব্যবস্থা করা হয়। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং তাহাদিগের শাখা প্রশাখা ও খালগুলি দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কৃষিক্ষেত্রসমূহে জলসেচনের বিশেষ সহায়তা করিয়াছে এবং যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়া ব্যবসা বাণিজ্যেরও উন্নতি সাধন করিয়াছে। বস্তুতঃ এই কারণে আমাদিগের দেশ বহু প্রাচীনকালে বাণিজ্যে খ্যাতি লাভ করিতে পারিয়াছিল। পূর্ব্বে গঙ্গার মূল-প্রবাহ ভাগিরথী খাত দিয়া প্রবাহিত হইত। (পদ্মা বা মেঘনা তখন সমুদ্রের খাড়ি ছিল, পরে নদীতে পরিণত হইয়াছে।) সেই সময় ভাগিরথীর উপর তাম্রলিপ্ত বা তমোলুক এবং সপ্তগ্রাম

অথবা ত্রিবেনী আমাদিগের দেশের প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীন, লঙ্কা, আরব এবং সুদূর রোমক প্রদেশ হইতে বড় বড় জাহাজ এই দুইটী বন্দরে আসিত এবং এই স্থান হইতে কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র, আদা, গম, চিনি, ধান্য প্রভৃতি দ্রব্য ক্রয় করিয়া আপনাপন দেশে চলিয়া যাইত। পূর্ব্ববঙ্গে সুবর্ণ-গ্রাম (সুবর্ণ-বণিকগ্রাম ঢাকা হইতে ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিল) এবং চট্টগ্রাম বন্দরও তখন বিখ্যাত ছিল। এখান হইতে বৈদেশিক বণিকেরা বিভিন্ন প্রকার পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইতেন। আমাদিগের দেশ সত্য সত্যই সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা—স্বর্ণ-প্রসূ ছিল। ইহার সমৃদ্ধি খ্যাতি দিগন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্রাট ঔরঙ্গজেব ইহার সমৃদ্ধি লক্ষ করিয়া দর্পের সহিত বলিয়াছিলেন, "এই স্থান সকল জাতির পক্ষে স্বর্গতুল্য।" পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে একজন চীনদেশের পরিব্রাজক বাঙ্গলাদেশের অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, "প্রজারা উৎপন্ন শস্যে সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতি-পাত করে, নগর সকল বহুজনাকীর্ণ। নগরের অধিবাসীগণ বাণিজ্য-সম্বন্ধে যে একেবারে অনভিজ্ঞ তাহা নহে। তাহারা সকলে স্ব-নির্ম্মিত জাহাজে চড়িয়া বাণিজ্য দ্রব্য দেশ দেশান্তরে প্রেরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।"

আমাদিগের দেশ কৃষিকার্য্যে উন্নতিলাভ করিয়াই এত সমৃদ্ধি-শালী হইয়াছিল। এদেশে শতকরা ৮৫ জন শস্যোৎপাদন করিয়া

জীবিকা অর্জ্জন করে। ইউরোপ প্রদেশে কিন্তু এইরূপ দেখা যায় না, কৃষিকার্য্য সেখানকার অধিবাসীদিগের প্রধান উপজীবিকা নহে। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল জাতি দেশবিদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিয়া সমৃদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহারা সকলেই কৃষি অপেক্ষা শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। বাংলা দেশে চারিদিকেই শ্যামল প্রান্তর অথবা স্নিগ্ধ বন-শ্রেণী; এখানে পাঁহাড় পর্ব্বত খুব কম। বরাকর রাণীগঞ্জ ছাড়া আর কোথাও বড় বড় কয়লার খনি নাই। বিলাত প্রভৃতি স্থানে এইরূপ খাল নদ নদী অথবা সমতলক্ষেত্র বেশী নাই, সেখানে কৃষিকার্য্যের সুবিধা হয় না, সেখানে প্রায়ই পাহাড় এবং সমতল ভূমি, আর অনেক কয়লার খনি। এই সকল খনির নিকটে সেখানকার লোকেরা বড় বড় কারখানা খুলে, এবং নূতন নূতন কলের যন্ত্রের সাহায্যে কত রকম সহজ উপায়ে বহুপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করে। যে স্থানে কারখানা স্থাপিত হয় তাহা ক্রমশঃ সহর হইয়া উঠে, দেশের অধিকাংশ লোকেরা গ্রাম হইতে সহরে আসিয়া কারখানায় কার্য্য করে। আমাদিগের দেশের কয়েক জায়গায় যদিও এইরূপ কারখানা খুলা হইয়াছে, কিন্তু এখানকার অধিকাংশ লোক কৃষিক্ষেত্রেই জীবন অতিবাহিত করে, সহরের কারখানায় কাজ করে না। এদেশের সভ্যতা পল্লী-গ্রামেই বিকাশলাভ করিয়াছে, সহরে নহে। অতীতের ইতিহাসে

আমাদিগের দেশে যতগুলি বড় বড় সামাজিক অথবা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল উহারা সকলেই গ্রাম হইতে উদ্ভূত হইয়া ক্রমে সমগ্র দেশময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল। আধুনিক ইউরোপে ইহার ঠিক বিপরীত দেখা যায়, সেখানকার সব আন্দোলনগুলিই সহরের চিন্তায় পুষ্ট হইয়া সর্ব্বশেষে পল্লী-গ্রামে পেঁাছায়।

কিন্তু আজকাল আমাদিগের পল্লীগ্রামের অবস্থা খুব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আমাদিগের দেশের কৃষকেরা এখন খুব দরিদ্র, বৎসরের অধিক সময় দুই বেলা ভাত তাহাদের জুটে না। বহুবৎসর চাষ হওয়াতে জমি অনুর্ব্বর হইয়া পড়িয়াছে। কৃষক অবস্থার মত ব্যবস্থা করিতে পারে না, সকলেই চিরন্তন প্রণালীতে চাষ করে, অধিকন্তু তাহারা বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, অধ্যবসায় হারাইয়া সামান্য চাকুরীর জন্য তাহারা এখন লালায়িত। কৃষিকার্য্যে উন্নতিলাভ করিয়া যদি কোন কৃষক কিছু টাকা সঞ্চয় করিতে পারে, সেও উহা হেয় মনে করিয়া ছাড়িয়া দেয় এবং তেজারতি ব্যবসায় অবলম্বন করে। যত্নাভাববশতঃ গো-জাতিরও অবনতি হইয়াছে। এখন গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে, কৃষকেরা স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিতেছে না। দেশের কৃষকেরা আজ দীন দুঃখী, দুর্ভিক্ষে এবং অন্নাভাবে প্রপীড়িত।

কৃষকদিগের ঐ দুর্গতির দিনে, আমাদিগের দেশে বর্ত্তমান কালোপযোগী কৃষি এবং শিল্প শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে, নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও উন্নত প্রণালীগুলি যাহাতে এখানকার কৃষকেরা অবলম্বন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা না করিলে কৃষিকার্য্যের উন্নতি একেবারেই অসম্ভব। কৃষকেরা যাহাতে মূলধন অল্প সুদেই পাইতে পারে তাহার সুবিধা করিতে হইবে, কারণ যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা অল্প সুদে টাকা ধার করিতে না পারিবে, ততদিনই তাহাদিগের পক্ষে অর্থসাপেক্ষ বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী বা নূতন যন্ত্রনিয়োগ করা অসম্ভব। বস্তুতঃ এই মূলধনের অভাবই কৃষিকার্য্যের অবনতির প্রকৃত কারণ। কৃষকদিগের নিজ নিজ কার্য্য করিবার মত মূলধন নাই। জমি বলদ, লাঙ্গল, বীজ প্রভৃতি কিনিতে তাহাদিগকে অত্যধিক সুদে টাকা ধার করিতে হয়। যে বৎসর অজন্মা হয়, সে বৎসর ধান চাউলও তাহারা মহাজনের নিকট ধার করে। এইরূপে দেনা করিয়া তাহারা মহাজনদিগকে ক্রমশঃ সর্ব্বস্ব দিতে বাধ্য হয়। যে বৎসর অধিক পরিমাণে শস্য হয়, সে বৎসরও তাহারা মহাজনকে উৎপন্ন ফসল দায়ে পড়িয়া খুব সস্তা দরে বিক্রয় করে। উপার্জ্জনের অধিকাংশ তাহারা এই প্রকারে বৎসর পর বৎসর দেনা শোধ করিবার জন্য ব্যয় করে, এই কারণে তাহারা আবার কর্জ্জ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় এবং দেনা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। একবার মহাজনের

দ্বারস্থ হইলে তাহাদিগকে আর উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে।

বস্তুতঃ দেশের এই সকল ঋণগ্রস্ত কৃষকদিগকে ঋণদায় হইতে মুক্ত করা বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের নিতান্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য জগতে, জর্ম্মনী এবং ইটালী প্রদেশে কৃষকদিগের অবস্থা ঠিক এইরূপ হইয়াছিল, কিন্তু সেখানকার সমাজনেতারা দেশের অবস্থা মত প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া সেখানে কৃষিকার্য্য পুনরায় উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছে। যে অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁহারা স্ব স্ব প্রদেশের দরিদ্র শ্রমজীবিগণকে ঋণদায় হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার নাম সমবায়-সমিতি। আমাদিগের সহৃদয় সরকার বাহাদুরও এদেশে ঐ প্রকার সমিতি স্থাপন করিয়া কৃষকদিগের সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই সমবায় সমিতিগুলির কার্য্যপ্রণালী প্রত্যেক কৃষক ও শিক্ষিত লোকের জানা একান্ত আবশ্যক। কোন একজন দরিদ্র কৃষক অল্প সুদে টাকা ধার পায় না, কারণ তাহার ঋণ পরিশোধ করিবার শক্তি মহাজনেরা সহজেই অবিশ্বাস করে। কিন্তু তাহার মত কয়েকজন যদি একত্র হইয়া নিজ নিজ সম্পত্তি সকল মিলিত করে, তাহা হইলে তাহাদিগের ঋণ পরিশোধ করিবার শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং মহাজনেরা তখন তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারে। এইরূপে কয়েকজন চাষী

মিলিত হইয়া তাহাদিগের সমবেত দায়িত্বে যদি টাকা ধার করে তাহা হইলে অতি সহজেই একটি সমবেত তহবিলের সৃষ্টি হইতে পারে। এই তহবিল হইতে তাহারা অত্যল্প সুদেই টাকা ধার করিতে পারিবে। যাহারা এইরূপে সমবেত তহবিল সৃষ্টি করে, তাহারা সমবায় সমিতির সভ্য হয়। অন্য কেহ ঐ তহবিল হইতে ধার লইতে পারে না। সমিতির যে সকল সভ্যেরা এই সমবেত তহবিল হইতে কর্জ্জ লইবে তাহার জন্য তাহারা সমিতির নিকট পৃথকভাবে দায়ী থাকে। সভ্যেরা সকলেই প্রত্যেকের আর্থিক অবস্থার সহিত পরিচিত বলিয়া, অযোগ্য ব্যক্তিকে অথবা অপব্যয়ের জন্য ধার দেওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

এই সমবেত তহবিল গঠনের আর এক উপায় আছে। অনেক সময়ে মহাজনদিগের নিকট কোন ধার না লইয়াও এই তহবিলের সৃষ্টি হইয়া থাকে। কৃষকেরা যে কখনও সঞ্চয় করিতে পারে না তাহা নহে। যদি তাহারা লভ্যাংশের কিয়দংশ খরচ না করিয়া কোন স্থানে গচ্ছিত করিতে শিখে, তাহা হইলে অনেকের সঞ্চিত অর্থে একটি সমবেত মূলধন ভাণ্ডারের সৃষ্টি হইতে পারে। এই ভাণ্ডার হইতে তাহারাই প্রয়োজন হইলে সহজেই ধার করিতে পারিবে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় অনেকগুলি সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমগ্র বাংলাদেশের সমবায়-সমিতিগুলির

মোট সভ্যসংখ্যা, ২২,৮০০ এবং মূলধন ৭ লক্ষ টাকা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টও সমবায়-সমিতির সভ্যগণকে অনেক উপায়ে উৎসাহিত করিতেছেন। তাহারা যে পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে, গবর্ণমেণ্টও ঐ পরিমিত টাকা দিতেছেন। এবং প্রথম তিন বৎসর উহার কোন স্থদ লইতেছেন না।

এইরূপ সমবায়-সমিতির প্রতিষ্ঠা কৃষিপ্রধান দেশ মাত্রেরই নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে নেতৃবর্গ সমাজের, শিক্ষিত সম্প্রদায়, গবর্ণমেণ্ট এবং সহৃদয় মহাজনগণ শ্রমজীবিগণের আর্থিক উন্নতিকল্পে তাহাদিগের জন্য এইরূপ সমিতি গঠন করিয়া দিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষিত লোকেরা সেখানে অনেক সময়ে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া এবং গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া সমবায়-সমিতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কৃষকদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন।

গুরুদক্ষিণা।

(১)

খুব গভীর বন, বনের তিন দিকে সমুদ্র, আর এক দিকে পাহাড়। পাহাড়ের নীচেই হিরণ্যধেনুর কুঠির। হিরণ্যধেনু একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাধ, ঐ পাহাড় দেশের রাজা। তাঁহার পত্নী ক্ষত্রিয় কন্যা, শত্রু হস্তে আত্মীয় স্বজন হারাইয়া ঐ বনে পড়িয়াছিল,

হিরণ্যধেনু তাহাকে আপনার গৃহে আশ্রয় দিয়া পরে বিবাহ করিয়াছিলেন। হিরণ্যধেনুর পুত্রের নাম একলব্য। একলব্য পিতার যোগ্যপুত্র, ব্যাধদিগের মধ্যে এখন শ্রেষ্ঠ বীর, মাতার নিকট হইতে সে ক্ষত্রিয়ের অদম্য তেজ পাইয়াছিল। নিষাদের পুত্র এখন ঠিক ক্ষত্রিয় কুমার। হিরণ্যধেনু শিকার করিতে গিয়াছিলেন, একলব্য তাহার মাতাকে বলিল, 'মা, তুমি ছোট বেলা হইতে আমাকে ক্ষত্রিয় হইতে বলিতে, ক্ষত্রিয় বীরদের প্রশংসা শুনাইতে,—কতদিন কত উপায়ে আমার হৃদয়ে তুমি ক্ষত্রিয় হইবার ইচ্ছা জাগাইয়া দিয়াছ। আমি এতদিন পরে এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। আজ আমি হস্তিনাপুরের রাজকুমারদিগকে নদীর ধারে দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিতে দেখিয়াছি। দ্রোণাচার্য্য হস্তিনায় থাকেন, আমি হস্তিনায় যাইব, সেখানে তাঁহার নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিয়া তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। তুমি আমাকে অনুমতি দাও, আমি আজই যাইতে চাই।" একলব্যের মাতা বলিলেন, "বৎস, তুমি রাজকুমারদিগের চেয়ে ক্ষত্রিয়গুণে কোন অংশেই হীন নহ, আমি বিশ্বাস করি যে তুমিই তোমার পিতৃকুল উজ্জ্বল করিতে পারিবে। কিন্তু বৎস, তোমার পিতাকে আসিতে দাও, তিনি আসিলে যাইও।" একলব্য শুনিল না, বলিল, "না মা, আমি এখনই যাইব, আমি চলিয়া গেলে তুমি পিতাকে জানাইও।" একলব্য মাতাকে প্রণাম করিল, মাতা

বলিলেন, "আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি যেন আচার্য্যের সমস্ত বিদ্যাই শিখিতে পার।" একলব্য বলিল, "আমি চলিলাম, এই আশীর্ব্বাদ যতদিন না পূর্ণ হয় ততদিন ফিরিব না।"

(২)

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া একলব্য অবশেষে দ্রোণাচার্য্যের মণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইল। মণ্ডপের মধ্যে একটি শ্বেত প্রস্তরখণ্ড; তাহার উপর আচার্য্য বসিয়াছিলেন। দূরে কুমারগণের ক্রীড়া-কোলাহল শুনা যাইতেছিল। একলব্য আচার্য্যের সম্মুখে যোড়-করে দাঁড়াইল, বলিল, "আমি নিষাধরাজ হিরন্যধেনুর পুত্র একলব্য, আপনার নিকট অস্ত্রশিক্ষা লাভ করিতে আসিয়াছি, আপনি আমায় শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন।" কিন্তু আচার্য্য তাহাকে প্রত্যাখ্যান করি-লেন। একলব্য অনেক অনুনয় বিনয় করিল কিন্তু তিনি শুনি-লেন না, নিষ্ঠুরভাবে

"দ্রোণ বলিলেন তুই হইস নীচজাতি।
তোরে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি॥"

(৩)

একলব্য আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া যাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার মন তাহাকে ফিরিয়া যাইতে নিষেধ করিল। আচা-র্য্যের সৌম্য মূর্ত্তি সে এতদিন যত্ন করিয়া হৃদয়ে বহণ করিয়াছিল, সে মূর্ত্তি আজ তাহার সম্মুখে! আজ তাহার কত সুখের দিন!

তিনি তাহাকে শিষ্য করিলেন না, তাহার প্রাণে আঘাত করিলেন, একলব্য তবুও তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। সরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অনিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে অর্জ্জুন আসিলেন, আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব, কে এ ক্ষত্রিয়কুমার, আর উনি বিষন্ন মুখে দাঁড়াইয়া কেন?" গুরুদেব বলিলেন, "ও ক্ষত্রিয়কুমার নহে, একজন পাগল। তুমি উহার জন্য ব্যস্ত হইও না।"

একলব্য ফিরিয়া চলিল; কিছুদূর চলিয়া, আবার স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। অর্জ্জুনের কথা ভাবিল, আহা অর্জ্জুনের কি কমনীয় কান্তি। অর্জ্জুনই আচার্য্যের যোগ্য শিষ্য। কোথায় অর্জ্জুন আর কোথায় সে, সে তাঁহার দাস হইবারও অযোগ্য। আবার ভাবিল, কেন, সে কি অর্জ্জুনের মত হইতে পারিবে না? কেন পারিবে না, এই বিষম আঘাতে কই তাহার উৎসাহ ত কমে নাই। যাহার মনে বড় হইবার আশা নিয়তই জাগিয়া রহিয়াছে সে কি চিরকালই ছোট থাকিবে? সে চণ্ডাল, কিন্তু চণ্ডাল কি ক্ষত্রিয় হইতে পারিবে না? নিশ্চয় পারিবে। একলব্য অনেকক্ষণ ভাবিল, তাহার প্রাণের মধ্য হইতে কে যেন কেবলই আশ্বাস দিতে লাগিল নিশ্চয় পারিবে—

"আছে এ জগৎ মাঝারে গোপনে
এক সে সুন্দর সিদ্ধি স্থান,

বাসনা থাকিলে যেতে পথ মিলে
কে যাবে কার কেঁদেছে প্রাণ।

সেথা জনমে বরণে নাহিক লাজ,
উজলে জীবন উজল কাজ,—
রতন ভূষণ মোহন সাজ
বাড়াতে পারে না মান।

বড় যার মন কুলীন সে জন
সবার সেথায় মিলে সিংহাসন
নিষাদ তনয় সেও ক্ষত্র হয়
তেজো বীর্য্যবান।"

এইরূপ একটা ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া সে একটু সুস্থ বোধ করিল। কিছুক্ষণ পরে সে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, সুনীল আকাশ অনন্তবিস্তৃত; দুই একটা শাদা মেঘ কোন সুদূরের পানে ধীরে ধীরে ভাসিয়া যাইতেছে। একলব্যের মন মেঘের সহিত সেই অনন্তের দেশে হারাইয়া গেল। একলব্য সব দুঃখ ভুলিয়া গেল, অনন্ত আকাশের দিকে চাহিতে চাহিতে একলব্যের ক্ষুদ্র অভিমান চলিয়া গেল। আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিল আকাশ ত চিরকাল সকলের নিকট সমানভাবে দাঁড়াইয়া আছে। আমি চণ্ডাল, আর অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, আকাশ চণ্ডাল ক্ষত্রিয় উভয়কেই সমান ভাবে স্নেহ করিতেছে, তবে আমাতে এবং অর্জ্জুনে তফাৎ হইবে

কেন ? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে অনেক পথ অতিক্রম করিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সন্ধ্যার সময় সে সমুদ্রের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ বসিয়া সমুদ্র গর্জ্জন শুনিল, সমুদ্র গর্জ্জন কেমন মধুর বোধ হইল। যতদূর দেখা যায় ততদূরই সমুদ্রের ঢেউ, শেষে আকাশ সমুদ্রের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, মনে হয় ঐ খানে বুঝি সমুদ্রের শেষ। সমুদ্রের ঢেউ উঠিতেছে পড়িতেছে, আবার উঠিতেছে আবার সমুদ্রের ক্রোড়ে লুকাইতেছে। ক্রমে ঢেউ তীরের নিকট আসিল, তীরে আছাড় খাইয়া তীরের উপর অনেক দূর ছুটিয়া আসিল, আবার ছুটিয়া পলাইল। যতক্ষণ একলব্য দাঁড়াইয়া রহিল ততক্ষণ এই একই দৃশ্য দেখিল, বুঝিল চিরকাল এই এক দৃশ্য দেখা যাইবে। একলব্য শান্ত হইল, হৃদয়ে মহান্ সমুদ্রের ছায়া পড়িয়া তাহার ক্ষুদ্র দুঃখ ভুলাইয়া দিল। যাহা কিছু বিশাল মহান্, মাথার উপরে অনন্ত আকাশ অথবা সম্মুখে অসীম সমুদ্র তাহা দেখিলেই মানুষ নিজের ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া যায়, তখন অভিমান চলিয়া যায়, ক্ষুদ্র দুঃখ আর থাকে না।

(৪)

একলব্য এখন শান্ত। সে নিষাদ বেশ দূর করিয়া, জটা বল্কল পরিধান করিয়াছে, সে এখন ব্রহ্মচারী। “আচার্য্য আমাকে প্রত্যাখান করিলেন, আমি অন্য গুরু চাহি না, আমি তাঁহাকেই প্রসন্ন করিব ; উপযুক্ত হইলে তিনিই আমাকে শিক্ষা দিবেন,” এই

ভাবিয়া একলব্য মাটীর এক দ্রোণ গড়িল এবং তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিল। এইরূপে সে বহুদিন ধরিয়া কঠোর সাধনা করিল, এবং সেই মাটির দ্রোণই তাহাকে সমস্ত শিক্ষা দিলেন।

(৫)

আজ রাজকুমারেরা মৃগয়ার জন্য ঐ বনে আসিয়াছেন। এক শিকারী আপনার কুকুর লইয়া এক মৃগের অনুসরণ করিল, কুকুর একলব্যকে দেখিয়া চীৎকার করাতে একলব্যের তপস্যার বিঘ্ন হইল। একলব্য আপনার অস্ত্রপ্রয়োগের লঘুতা পরীক্ষা করিবার জন্য কুকুরের মুখে এককালে সাতটি শর নিক্ষেপ করিল।

"না মরিল কুক্কুর না হইল মুখে ঘা।
অলক্ষিতে কুক্কুরের রুধিলেক রা॥"

কুকুর বাণ মুখে করিয়া রাজকুমারদিগের নিকটে যাইতেই সকলেই বিস্মিত হইলেন, বলিলেন,

"এ হেন অদ্ভুত কর্ম্ম কভু নাহি শুনি।
বহু শিক্ষা জানি এই বিদ্যা নাহি জানি॥
লজ্জায় মলিন হৈল যত ভ্রাতৃগণ।
চল যাই দেখিব বিন্ধিল কোন জন॥"

অনেক অনুসন্ধানের পর অবশেষে তাঁহারা একলব্যের নিকট আসিলেন, দেখিলেন ব্রহ্মচারী একাকী বাণ নিক্ষেপ করিতেছে। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ব্রহ্মচারী বলে মম একলব্য নাম।
অস্ত্রশিক্ষা করিলাম দ্রোণ গুরু স্থান॥"

অর্জ্জুনের হৃদয় অভিমানে পূর্ণ হইল, তিনি ভাবিলেন গুরু ব্রহ্মচারীকে তাঁহার অধিক স্নেহ করেন, সকলেই হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিলেন। অর্জ্জুন গুরুকে একলব্যের অদ্ভুত অস্ত্রকৌশলের বিষয় প্রশ্ন করিলেন। গুরু তাহার উত্তর দিতে না পারিয়া অর্জ্জুন সহ আশ্রমে চলিয়া গেলেন। একলব্য তখন মাটীর দ্রোণের সম্মুখে বসিয়া পূজা করিতেছিল, আচার্য্যকে দেখিয়া—

"দূরে থাকি ভূমি লুঠি প্রণাম করিল।
কৃতাঞ্জলি করিয়া অগ্রেতে দাঁড়াইল॥"

দ্রোণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার শিষ্য"? একলব্য উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। দ্রোণ বুঝিতে পারিলেন, বলিলেন, "বৎস একলব্য, গুরুদক্ষিণা না দিলে বিদ্যা পূর্ণ হয় না, তুমি আমাকে কি দক্ষিণা দিবে?"

"একলব্য বলে 'প্রভু মম ভাগ্য বশে।
কৃপা করি আপনি আইলা এই দেশে॥
এ দ্রব্য সে দ্রব্য নাহি করিব বিচার।
সকল দ্রব্যেতে হয় গুরু অধিকার॥
যে কিছু মাগিলা প্রভু সকলি তোমার।
আজ্ঞা কর গুরু করিলাম অঙ্গীকার॥'"

দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি অর্জ্জুনের জন্য একলব্যের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলী প্রার্থনা করিলেন। একলব্য অঙ্গুলী কর্ত্তন করিয়া হাসিতে হাসিতে গুরু চরণে সমর্পণ করিল। আচার্য্য বলিলেন, "প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্য আজ আমাকে ব্যাধের কাজ করিতে হইল, বৎস একলব্য, আমি আশীর্ব্বাদ করি পরজন্মে তোমার যেন উচ্চকুলে জন্ম হয়।" একলব্য প্রণাম করিল। আচার্য্য ও অর্জ্জুন চলিয়া গেলেন। আচার্য্য ও অর্জ্জুন চলিয়া যাইতেছিলেন, একলব্য অনিমেষনয়নে উহাদিগকে দেখিতেছে, এমন সময়ে একলব্যের মাতা উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বৎস, আমাকে ক্ষমা কর, বৎসর পর বৎসর গেল, আর আমি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিলাম না, আমার প্রাণ তোমার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, চল ঘরে ফিরিয়া চল।" একলব্য বলিল, "চল মা; আমার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে, আমি তোমার সঙ্গেই যাইতেছি।" মাতা বলিলেন, "একি, তোমার হাতে রক্ত কেন, তোমার অঙ্গুলী কোথায়?" একলব্য তখন তাহার মাতাকে তাহার প্রতিজ্ঞা, গুরুর নিকট প্রত্যাখ্যান, এবং কঠোর তপস্যা ও দক্ষিণার কথা বলিল। মাতা আচার্য্যকে নিষ্ঠুর পাপিষ্ঠ বলিয়া তিরস্কার করিলেন। একলব্য বলিল, "মা, তুমি আমার গুরুদেবের নিন্দা করিও না। যাহার নিকটে আমি এই অদ্ভুত শিক্ষা লাভ

করিয়াছি একটি ক্ষুদ্র অঙ্গুলী দিলে তাঁহার ঋণ কি প্রতিশোধ করা যায়? আমি বিদ্যার আনন্দে এখন তৃপ্ত, আমার বাম হস্ত ও মন্ত্রজ্ঞান এখনও অক্ষত, আমি নিজে আমার পিতৃকুল উজ্জ্বল করিতে পারিলাম না, এই আমার দুঃখ রহিল, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমার অনুজেরা আমার নিকট শিক্ষা করিয়া আমাদিগের বংশ উজ্জ্বল করুক।"

হাসন-হোসেন।

মহম্মদের জামাতার নাম আলী। হাসন ও হোসেন এই আলীর দুই পুত্র। আলীর মৃত্যুর পর হাসন মদিনার সিংহাসনে আরবের খালিফারূপে অধিরোহণ করিলেন। সেই সময়ে সিরীয়ার সিংহাসনে আয়জিদ অধিষ্ঠিত ছিলেন। আয়জিদ হাসনের প্রধান শত্রু হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার প্রাণবধের জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিলেন। সে সকলই ব্যর্থ হইলে, আয়জিদ তাঁহার ভ্রাতা-দিগকে জানাইলেন যে, তাহাদিগের মধ্যে যে কেহ কোন মতে হাসনের প্রাণবধ করিবে, তাহাকে তিনি তাঁহার উজীর করিবেন। কুফীর প্রজারা তাহা শুনিয়া মিছামিছি হাসনকে সংবাদ পাঠাইল যে আয়জিদ তাহাদিগের উপর অত্যাচার করিতেছেন। এ সময়ে তিনি যদি দয়া করিয়া কুফীরাজ্যে আসেন, তাহা হইলে তাহারা

সকলেই তাঁহার হইয়া আয়জিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। হাসন তাহাদিগের কথায় ভুলিয়া কুফিদেশে আসিলেন।

একদিন একজন বর্ষাধারী লোক বর্ষার মুখে বিষ মাখাইয়া অন্ধ সাজিয়া হাসনের নিকট আসিল এবং বলিল, "আমার চক্ষু নাই, আমি আপনার চরণে চক্ষু দুইটি ঘসিতে চাই, তাহা হইলেই আবার আমি চক্ষু পাইব" এই বলিয়া সে হাসনের গায়ে আসিয়া পড়িল এবং বর্ষাঘাতে তাঁহার শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল। হাসনের অনুচরেরা সেই লোককে মারিতে উদ্যত হইলে, তিনি তাহাদিগকে বারণ করিয়া বলিলেন, "দেখ, রক্তের পরিবর্ত্তে রক্ত দেখাইতে হয়, কিন্তু এখনও আমি বাঁচিয়া আছি; অতএব তোমরা কেন উহার প্রাণবধ করিবে? তোমরা জানিও যে ভগবান এই শঠকে প্রকৃত অন্ধ করিয়া উপযুক্ত শাস্তি দিবেন।" এইরূপে তিনি সেই দুষ্ট লোককে ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু নিজে অনেক দিন বিষের জ্বালায় কষ্টভোগ করিয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি সেই শত্রুপুরী ত্যাগ করিয়া মদিনায় ফিরিয়া যাইলেন। মদিনায় ফিরিয়া যাইয়া আয়জিদের ষড়যন্ত্রে জল পান করিতে বিষ খাইয়া তিনি অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

ভ্রাতার মৃত্যুর পর হোসেন খলিফা হইলেন। তিনি হাসনের জন্য অনেক কাঁদিলেন, কুফীর প্রজারা তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং তাঁহাকে জানাইল, আপনি যদি অনুগ্রহ

করিয়া এদেশে আসেন তাহা হইলে এবার আমরা নিশ্চয়ই ধর্ম্মের জন্য আপনার হইয়া আয়জিদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করিব। হোসেন সমস্ত অবস্থা জানিবার জন্য স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্র মোসলেমকে কুফীতে পাঠাইলেন। মোসলেম কুফীতে আসিলে অনেক লোক তাঁহার পূজা করিল। তিনি কুফীর অধিবাসীদিগকে হোসেনের অত্যন্ত অনুরাগী দেখিয়া তাহাকে কুফীতে আসিতে পত্র লিখিলেন।

এদিকে আয়জিদ কুফীবাসীদিগের ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমার প্রজাদিগের মধ্যে যে হোসেনের পক্ষ অবলম্বন করিবে তাহার আর রক্ষা নাই, সে সবংশে মরিবে।" কুফীবাসীরা ভীত হইয়া মোসলেমকে পলাইয়া যাইতে পরামর্শ দিল, কিন্তু মোসলেম অনতিবিলম্বেই ধৃত হইলেন এবং সুবাদারের আদেশে নিহত হইলেন। তাঁহার দুইটি অনাথ শিশু কারাগারে বন্দী হইল। কারাধ্যক্ষ খুব দয়ালু লোক ছিলেন, তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। শিশু দুইটি কয়েকজন ব্যাপারীর সহিত চলিয়া যাইতেছিল। সন্ধ্যার সময় তাহারা সঙ্গী ও পথ হারাইল, তখন উভয়ে একটি খেজুর গাছের তলায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় হারিস নামক এক ব্যক্তির দাসী জল লইয়া সে পথ দিয়া যাইতেছিল, সে তাহাদিগকে দেখিয়া বলিল, "তোমরাই কি মোসলেমের পুত্র?" শিশু দুইটি তাহাদিগের পিতার নাম শুনিয়া আরও কাঁদিতে লাগিল। দাসী ছেলে দুটিকে নিজ প্রভুপত্নীর

নিকট আনিল, তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া মাতৃস্নেহে অভিভূত হই-লেন, কোলে লইয়া তাহাদিগের সহিত তিনিও কতই কাঁদিলেন ও তাহাদিগকে নিজের পুত্রের মত পালন করিতে লাগিলেন। এ দিকে হারিসের উপরই তাহাদিগের ধরিবার ভার ছিল। কিন্তু তাহার পত্নী স্বামীকে কোন কথা জানাইল না, পার্শ্বের ঘরে ছেলে দুটিকে লুকাইয়া রাখিল। রাত্রিতে শিশুদ্বয় স্বপ্ন দেখিল যেন তাহাদিগের পিতা মোসলেম আসিয়া তাহাদিগকে খুঁজিতেছে। হারিস তাহাদিগের ক্রন্দন শুনিতে পাইয়া শীঘ্রই তাহাদিগের ঘরে আসিল এবং তাহাদিগকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল। তাহার পত্নীর নিষেধবাক্যে সে কর্ণপাত না করিয়া তাহাদিগকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে সেই ঘর হইতে টানিয়া নদী-তীরে লইয়া গেল এবং তথায় তাহাদিগকে হত্যা করিল।

এদিকে হোসেন মোসলেমের পত্র পাইয়া পরিবার পরিজন এবং কতিপয় অনুচরের সহিত কুফীরাজ্যে আসিলেন। আয়জিদ, এই সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য সেনাপতিকে পাঠাইলেন। সেনাপতি এক সহস্র সৈন্য লইয়া কারবালা নামক স্থানে হোসেনের সম্মুখীন হইল। হোসেন আয়জিদের ন্যায় দুর্ব্ব-ত্তকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিতে অস্বীকার করিলেন এবং সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণবিসর্জ্জন করাই শ্রেয় মনে করিলেন। শত্রুপক্ষে ৩০ হাজার লোক, তাঁহার কেবল মাত্র ৭২ জন। শত্রুরা

ইউফ্রেটীস নদীর জল বন্ধ করিয়া দিয়াছিল; সুতরাং তাঁহারা দারুণ পিপাসায় পাগলের মত হইলেন। তৃষ্ণায় কাতর হইয়া হোসেন শত্রুপক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ মুসলমানগণ, তোমরা কি জান না যাঁহার মন্ত্র দিবারাত্র তোমরা উচ্চারণ করিয়া থাক, আমি তাঁহারই দৌহিত্র। তোমরা কি তাঁহাকে চাহ না, অথবা ভয় কর না? আচ্ছা, আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর; পরিবার সহ আমাকে এদেশ ছাড়িয়া পারস্য দেশে যাইতে দাও। যদি তাহাও না কর, তবে ঈশ্বরের দোহাই, একটু জল দিয়া আমাদিগের প্রাণ রক্ষা কর। দেখ, তোমাদিগের হাতী, ঘোড়া, উট সকলেই প্রচুর পরিমাণ জল পাইতেছে, কিন্তু আমি কি হতভাগ্য! আমার পরিবারবর্গ জলের জন্য হাহাকার করিতেছে, জলাভাবে মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ নাই, শিশুগণের কণ্ঠ শুষ্ক; তোমরা কি ইহা দেখিয়াও দেখিতেছ না?"

হোসেনের কাতরস্বরে সকলের হৃদয় বিচলিত হইল। অনেকেই তাঁহার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল, কিছুকালের জন্য শান্তিবাদ্য বাজিয়া উঠিল। কিন্তু শান্তি কোথায়? তাহার পরিবার মধ্যে সর্ব্বত্র 'জল' 'জল' রবে হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ উঠিতেছে।

পরদিন আবার রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। আজ হোসেন ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণবিসর্জ্জন করিবেন স্থির করিয়াছেন। আত্মীয় স্বজনকে সান্ত্বনা দিয়া তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শত্রুসেনা তাঁহার প্রবল

আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না, নদীর পর পার পর্য্যন্ত তাহারা বিতাড়িত হইল। হোসেন রণশ্রমে দারুণ পিপাসায় কাতর, তিনি জল পাইলেন বটে কিন্তু হায়! তখনই তৃষ্ণার্ত্ত কোমলপ্রাণ বালক-বালিকাদিগের করুণ-মুখ মনে পড়িল, আর তিনি জল পান করিতে পারিলেন না। শত্রুরা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে নিরস্ত্র হইয়া তিনি ক্ষণকালের জন্য তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন এবং নমাজ করিতে বসিলেন, প্রথম বার নমাজ করিয়া উঠিয়া যেমন তিনি দ্বিতীয়বার জানু পাতিবার উপক্রম করিবেন, সেই মূহূর্ত্তেই তাঁহার মুণ্ড দেহ হইতে তরবারির আঘাতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইল।

রামপ্রসাদ।

তোমরা অনেকেই হয়ত রামপ্রসাদের নাম শুনিয়া থাকিবে, তাঁহার সম্বন্ধে আজ তোমাদিগকে কিছু বলিতেছি। তাঁহার জীবনের দুই একটি ঘটনা ভিন্ন বিশেষ কিছু জানা নাই। যাঁহারা সংসারের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া নির্জ্জনে ও নির্ব্বিবাদে জীবন যাপন করেন, তাঁহাদের জীবন ঘটনাময় নহে। ইতিহাসের সহিত তাঁহাদের কোনই সম্বন্ধ নাই; কিন্তু তবুও তাঁহারা জগতে যে শ্রেষ্ঠ লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। রামপ্রসাদ এই প্রকারের একজন লোক। ২৪ পরগণা জেলার হালিসহরের নিকট কুমারহাটা গ্রামে

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জন্ম হয়। ১৭।১৮ বৎসরের সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় ; পিতার মৃত্যুতে তাঁহার পরিবারবর্গ অসহায় হইয়া পড়িলেন, বালক তাঁহাদিগের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন গাহিয়াছিলেন ঃ—

দুটো দুখের কথা কই।
দুঃখের কথা কইগো তারা মনের কথা কই ॥

কে বলে তোমারে তারা দীন দয়াময়ী।
কারেও দিলে ধনজন মা হয় হস্তী-রথীজয়ী ॥
আর কারো ভাগ্যে মজুর খাটে, শাকে অন্ন মিলে কই।
কেহ থাকে অট্টালিকায় আমার ইচ্ছা তেমনি রই ॥
ওমা তারা কি তোর বাপের ঠাকুর, আমি কি কেউ নই ?
কারো অঙ্গে শাল দোশালা, ভাতে চিনি দই।
আবার কারো ভাগ্যে শাকে বালি, ধানে ভরা খই ॥
কেউবা বেড়ায় পাল্কী চ'ড়ে, আমি বোঝা বই।
(মাগো) আমি কি তোর পাকা ধানে দিয়েছি গো মই ॥
প্রসাদ বলে তোমায় ভুলে আমি জ্বালা সই।
ওমা আমার ইচ্ছা অভয় পেয়ে চরণ ধূলা লই ॥

অগত্যা তাঁহাকে লেখা পড়া ছাড়িয়া চাকুরী খুঁজিতে হইল। কলিকাতায় কোন ধনীলোকের গৃহে তিনি মুহুরিগিরি কাজ

পাইলেন ; কিন্তু তাঁহার মন ঈশ্বরে পূর্ণ ছিল, ঐ কাজে তাঁহার মন বসিল না। তিনি ভাবিতেন—

"ম'লেম ভূতের বেগার খেটে।
আমার সম্বল নাই কো গেঁটে॥
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে॥"

আর মাঝে মাঝে বলিতেন—

"মা আমায় ঘুরাবি কত
কলুর চোক ঢাকা বলদের মত॥"

হিসাবের কথা তাঁহার মনে থাকিত না, তিনি তাঁহার মায়ের ভালবাসায় পূর্ণ থাকাতে অনেক সময় আপন অজ্ঞাতে হিসাববহির পাতার চারিপার্শ্বে কালীনাম ও গান লিখিয়া ফেলিতেন। তিনি ধনীর তহবিলদারী পাইলেন বটে কিন্তু সেই চাকুরী ছাড়িয়া কালীর তহবীলদার হইবার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিতে লাগিল।

"আমায় দে মা তবীলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী॥
পদরত্ন-ভাণ্ডার সবাই লোটে ইহা আমি,সহিতে নারি।"

রামপ্রসাদের প্রভু খাতা দেখিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। তিনি তাঁহার গানগুলি পড়িয়া বুঝিয়াছিলেন যে এই ১৬ বৎসরের বালক তহবিলদারী কার্য্য অপেক্ষা মহৎ কার্য্যের জন্য জগতে আসিয়াছে।

তাঁহার পরিবারের ব্যয় ভারের জন্য ৩০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি স্থির করিয়া দিলেন।

রামপ্রসাদ কুমারহাটায় ফিরিয়া আসিলেন, কুমারহাটায় ফিরিয়া আসিয়াও রামপ্রসাদ সুস্থির ছিলেন না, কেবলি কাঁদিয়া বলিতেন।

"আমি কাজ হারালাম কালের বশে
গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে।
যখন, তারা, ধন উপার্জ্জন করেছিলাম দেশ বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাই ছিল আপন বশে॥
এখন আমার ধন উপার্জ্জন না হইল দশার শেষে
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত নির্ধন বলে সবাই দূষে॥
যমদূত এসে শিয়রে বসে ধর্‌বে যখন অগ্রকেশে
তখন সাজিয়ে মাচা কলসী কাচা, বিদায় দিবে দণ্ডী বেশে॥
হরি হরি বলি শ্মশানেতে ফেলি, যে যার যাবে আপন বাসে।
রামপ্রসাদ মলো কান্না গেল অন্ন খাবে অনায়াসে"।

কিন্তু চালাকি করিয়া জগতে কোন মহৎ লাভ করা যায় না। যাহাকিছু পাইলে মানুষ ধন্য হইবে তাহা কি কেহ সহজে পায়? কুমারহাটায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি কঠোর সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। যে স্থানে বসিয়া তিনি পূজা করিতেন, সে স্থানের লোকেরা তাহা এখনও দেখাইয়া দেয়, আজ পর্য্যন্ত অনেক গায়ক মজুরী করিতে

যাইবার পূর্ব্বে এই স্থানে আসিয়া গান করে ও জিহ্বায় মাটি ছুঁয়াইয়া থাকে।

মাকে পাইবার জন্য বহু বৎসর ধরিয়া তিনি এইরূপে কঠোর সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। যখনই মনে ভক্তির উদয় হইত তখনই গান গাহিতেন। গান রচনা করিবার তাঁহার সময় অসময় ছিল না, মুখে মুখে খুব সহজেই তিনি গান রচনা করিতে পারিতেন। রচিত গানগুলি তিনি কাগজে কলমে লিখিয়া রাখিতেন না, সে গুলি কেমন হইল ভাবিয়া দেখিবারও তাঁহার সময় হইত না। তাঁহার গানে কোন রকম বাক্‌চাতুরী নাই, গানের পদগুলি নিতান্ত সরল। তিনি পাখীর মত আপন মনে গান গাহিতেন, এবং নিজের ভাবেই বিভোর হইয়া থাকিতেন। কিন্তু জগৎ তাঁহার গান শুনিয়া মুগ্ধ হইল। তাঁহার স্বরচিত সুর শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হয়, আবার ইহা খুব সহজ, যে গান জানে না সেও গাহিতে পারে। ক্রমে রামপ্রসাদ একজন প্রসিদ্ধ সাধক হইয়া পড়িলেন, দেশদেশান্তর হইতে অনেক লোক সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট আসিত, তাঁহার ভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইত, তাঁহার গান সহজেই তাহাদিগের প্রাণে লাগিত, সকলে তাঁহার গান শিখিয়া দেশে দেশে গাহিয়া বেড়াইত।

সাধারণতঃ যে সমস্ত গান প্রচলিত, তাহা ছাড়া বাকীগুলি আমাদিগের আর পাইবার উপায় নাই। তিনি আপন গানের সংখ্যার বিষয়ে বলিয়াছেন ঃ—

"লাখ উকীল করেছি খাড়া
সাধ্য কি মা ইহার বাড়া ?"

কিন্তু এক লাখ দূরে থাক তাঁহার পাঁচ শত গানও আমরা পাই না।

সেই সময়ে নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাংলা দেশে বিদ্বান লোকের খুব আদর করিতেন। তিনি তাঁহার নাম শুনিলেন এবং কুমারহাটায় আসিয়া তাঁহাকে নিজের সভায় আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রামপ্রসাদ সংসার বিরাগী—

"আমি তাই অভিমান করি
আমায় করেছ যে মা সংসারী"

তিনি যাইলেন না। রাজা তাঁহাকে একষট্টি বিঘার নিষ্কর ভূমি ও "কবিরঞ্জন" উপাধি দান করিলেন, এবং মাঝে মাঝে কুমারহাটায় আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতেন, তাঁহার সাধনার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনা যায়, তাহাদের মধ্যে এই দুইটি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

এক দিন রামপ্রসাদ ঘরের বেড়া বাঁধিতেছিলেন, তাঁহার কন্যা বেড়ার অপর পারে বসিয়া দড়ি ফিরাইয়া দিতেছিল। রামপ্রসাদ আপন মনে তন্ময় হইয়া গান করিতেছিলেন, তাঁহার কন্যা কার্য্যান্তরে হঠাৎ সেখান হইতে চলিয়া গেল, তিনি তাহা দেখেন নাই, দড়িও পূর্ব্ববৎ ফিরিয়া আসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ

পরে কন্যা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে বেড়া অনেক দূর বাঁধা হইয়া গিয়াছে, জিজ্ঞাসা করায় রামপ্রসাদ বলিলেন,—"কেন মা তুমিই ত দড়ী ফিরাইয়া দিয়াছ।" কন্যা বলিলেন, "না, আমি ত এতক্ষণ এখানে ছিলাম না।" তখন রামপ্রসাদ সকল কথা শুনিয়া বুঝিলেন যে মা স্বয়ং কন্যারূপে আসিয়া তাঁহার দড়ি ফিরাইয়া দিতেছিলেন। মা সম্মুখে আসিলেন তবুও তিনি তাঁহাকে দেখিলেন না, এই দুঃখে তিনি গাহিয়া উঠিলেন,—

" মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
নয়ন থাকতে না দেখলি মন, এ কেমন তোর কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলতে এলেন কৈলাস হতে, বেঁধে গেলেন তোর
ঘরের বেড়া॥"

আর একদিন রামপ্রসাদ গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী আসিলে তাঁহার মাতা বলিলেন, "রামপ্রসাদ! কে একজন স্ত্রীলোক তোর গান শুনিতে আসিয়াছিল, তোর দেখা না পাইয়া চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালে কি লিখিয়া গিয়াছে। রামপ্রসাদ লেখা দেখিলেন, "আমি অন্নপূর্ণা তোমার গান শুনিতে আসিয়াছিলাম, এখন অপেক্ষা করিতে পারি না, তুমি কাশীতে গিয়া আমাকে গান শুনাইয়া আসিবে।" তখনই ভিজা কাপড়ে রামপ্রসাদ মাতাকে লইয়া কাশী চলিলেন, গাহিলেন,

"আমি কবে কাশীবাসী হব।
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী স্বর্ণময়ীর, শরণ লব।

৫

আর বব বম্ বম্ ভোলা বলে—
নৃত্য করে গাল বাজাব ॥”

পথিমধ্যে ত্রিবেণীর নিকট কোন গ্রামে তিনি এক রাত্রি ছিলেন। সেই রাত্রিতে অন্নপূর্ণা তাঁহাকে কাশী না গিয়া সেইখানেই গান শুনাইতে বলেন। তিনি তথায় অনেক গান করেন।

“আর কাজ কি আমার কাশী।
ওরে কালীপদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি ॥
ওরে রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল না বাসি।
ঐযে গলাতে বেঁধেছে আমার কালো নামের ফাঁসি ॥”

পার্ব্বতীর তপস্যা।

প্রজাপতি দক্ষ ব্রহ্মার পুত্র। তাঁহার কন্যা সতী মহাদেবের পরম পতিব্রতা স্ত্রী। দক্ষযজ্ঞে মহাদেব অপমানিত হইলে স্বামীর অপমান সতী দেবীর অসহ্য বোধ হইয়াছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করেন এবং হিমালয়ের রাণী মেনকার কন্যা হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল পার্ব্বতী।

পার্ব্বতী মাতাপিতার খুব আদরের কন্যা। অমাবস্যার পর চন্দ্র যেমন রোজ বড় হয় আর বেশী সুন্দর দেখায়, তেমনি পার্ব্বতী ক্রমে বড় হইতে লাগিলেন, এবং তাঁহার রূপ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

হিমালয়ের উপরে গঙ্গার তীরে বসিয়া ছোট ছোট বালিকাদিগের সহিত পার্ব্বতী সমস্ত দিনই খেলা করিতেন। পূর্ব্বজন্মে তিনি যে সব বিদ্যা শিখিয়াছিলেন, শীঘ্রই সে সব আবার শিক্ষা করিয়া ফেলিলেন। ক্রমশঃ পার্ব্বতীর বিবাহের বয়স উপস্থিত হইল তিনি অপরূপ সুন্দরী হইয়া উঠিলেন। এক দিন নারদ আসিয়া হিমালয়কে বলিয়া গেলেন যে পার্ব্বতীর সঙ্গে মহাদেবের বিবাহ হইবে। তাহা শুনিয়া হিমালয় পার্ব্বতীর আর কোন বরই খুজিলেন না, মনে মনে ভাবিলেন মহাদেব ছাড়া আর কে পার্ব্বতীর উপযুক্ত বর আছে? কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা মহাদেবকে বলিতে পারিলেন না, কেন না মহাদেব যদি বিবাহ করিতে না চান তাহা হইলে তাঁহার বড় অপমান হইবে।

এদিকে সতী দেহত্যাগ করিলে, মহাদেব হিমালয় পাহাড়ের এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। অদূরে গঙ্গা দেবদারু বৃক্ষ অভিষিক্ত করিয়া বহিয়া যাইত, মৃগনাভির গন্ধে এবং কিন্নরীদিগের গানে চারিদিক আমোদিত থাকিত, সিংহেরা মধ্যে মধ্যে গর্জ্জন করিত, সিংহের গর্জ্জন শুনিয়া মহাদেবের বৃষ অহঙ্কার করিয়া তুষার শিলার উপর খুরাঘাত করিত এবং আরও উচ্চে চীৎকার করিত, হরিণেরা তখন সভয়ে তাহার প্রতি চহিয়া থাকিত। দেবদারু বৃক্ষের তলে একটি বেদি, বেদির উপর ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসনে তিনি নিস্পন্দ প্রশান্ত হইয়া বসিয়া

থাকিতেন। তাঁহার দৃষ্টি নাসিকাগ্রের উপর স্থির থাকিত, নির্বাতপ্রদেশে নিষ্কম্প প্রদীপের মত তাঁহাকে দেখাইত। তাঁহার কপালের চক্ষু হইতে জ্যোতিঃ নির্গত হইত। তাঁহার জটাজুট সর্পের দ্বারা বাঁধা থাকিত। রুদ্রাক্ষের মালা দুই ফের করিয়া কর্ণদ্বয়ে ন্যস্ত থাকিত। কৃষ্ণসার হরিণের চর্ম্ম গ্রন্থি দ্বারা উত্তরীয়-রূপে তাঁহার শরীরে সংলগ্ন ছিল, উহার শ্যামবর্ণ তাঁহার নীলবর্ণ কণ্ঠের সংস্পর্শে আরও নীল দেখাইতেছিল। তাঁহার অনুচর-গণও স্থির হইয়া চারিদিকে বসিয়া থাকিত। পিতার কথামত পার্ব্বতী প্রত্যহ পর্ব্বত প্রদেশে যাইয়া মহাদেবের আসন ধুইয়া আসিতেন; ফুল এবং অন্যান্য পূজার উপকরণ আনিয়া দিতেন।

বসন্তকাল, নূতন সবুজ পাতায় বন ছাইয়া গিয়াছে। অনেক রকম ফুল ফুটিয়াছে। এমন সময় একদিন পার্ব্বতী অশোক ও কর্নিকার ফুলের গহনা ও লাল কাপড় পরিয়া সখীদের সঙ্গে শিবের তপো-বনে গেলেন। মহাদেব তখন তপস্যামগ্ন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিল। তখন ইহাঁরা নিকটে যাইয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার পায়ের কাছে একরাশি সুন্দর ফুল রাখিলেন। মন্দাকিনী হইতে পার্ব্বতী মহাদেবের জন্য পদ্মফুলের বীজের একগাছি মালা আনিয়াছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে মহাদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কোমল হাতে সেই মালাটি ধরিলেন। মহাদেব যেমন সেটি লইতে যাইবেন ঠিক সেই সময়ে মুহূর্ত্তের জন্য তিনি পার্ব্বতীর

রূপে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই মন সংযত করিলেন, এবং পার্ব্বতী নিকটে থাকাতে তপস্যার বিঘ্ন হইতেছে দেখিয়া সেই স্থান হইতে অদৃশ্য হইলেন। পার্ব্বতী দেখিলেন তাঁহার এত রূপ সব বিফল হইয়া গেল, তাঁহার পিতার ইচ্ছা পূরিল না। তাঁহার সখীগণ এই সব দেখিলেন বলিয়া তিনি আরও বেশী লজ্জিত হইলেন। কোনও মতে পার্ব্বতী গৃহে ফিরিয়া যাইতেছিলেন এমন সময় তাঁহার পিতা আসিয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তখন পার্ব্বতী ভয়ে কাঁপিতেছিলেন, তাঁহার চক্ষু মুদিয়া গিয়াছিল। গৃহে যাইয়া পার্ব্বতী মনে মনে রূপকে খুব নিন্দা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন যে তাঁহার ত এত রূপ, কিন্তু তাহাতেও মহাদেব তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। পার্ব্বতী স্থির করিলেন, মহাদেবকে স্বামীরূপে পাইবার জন্য তিনি তপস্যা করিবেন। ইহা শুনিয়া পার্ব্বতীর মা মেনকা বড় ভয় পাইলেন। তিনি পার্ব্বতীকে বলিলেন, “বাছা, এই হিমালয় পর্ব্বতে অনেক দেবতা থাকেন, তুমি তাঁহাদের মধ্যে কাহাকে বিবাহ কর। তোমার শরীর বড় কোমল, তুমি কি তপস্যা করিতে পার ?” ইহাতে কিন্তু পার্ব্বতীর মন ফিরিল না। তিনি সখী দ্বারা পিতাকে জানাইলেন যে তিনি তপস্যা করিতে চান। পিতার মত পাইয়া পার্ব্বতী সখীদের সঙ্গে এক পাহাড়ের চূড়ায় গিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সে বড় কঠিন তপস্যা। কেহ আগে স্বপ্নেও ভাবে নাই যে এমন

আদরের কন্যা এত কঠিন তপস্যা করিতে পারিবে। তিনি গায়ের গহনা খুলিয়া ফেলিলেন, চুল খুলিয়া দিয়া জটা বাঁধিলেন; হাতে মাথা রাখিয়া মাটির উপর ঘুমাইতেন। গঙ্গা হইতে জল আনিয়া তিনি অনেকগুলি বৃক্ষকে পালন করিতে লাগিলেন। হরিণদিগকে তিনি অঞ্জলি ভরিয়া ধান দিতেন, তাহারা স্নেহভরে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। এইরূপ অনেক দিন তিনি তপস্যা করিলেন। ইহাতেও যখন ফল হইল না তখন পার্ব্বতী আরও কঠিন তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন। বৃষ্টির জল ছাড়া কিছুই খাইতেন না। বর্ষাকালের রাত্রিতে যখন তিনি শিলাতলে শয়ন করিয়া থাকিতেন, তখন বিদ্যুৎ হানিত, বজ্রের শব্দ হইত, আর অনবরত বৃষ্টি পড়িত। দুরন্ত শীতের রাত্রিতে যখন চারিদিকে বরফ পড়িত তখন তিনি জলের মধ্যে থাকিতেন, আর সুদূরে চক্রবাক চক্রবাকীর ক্রন্দন শুনিয়া নিজেও কাঁদিয়া ফেলিতেন। কখন কোন মুনিও এত কঠিন তপস্যা করেন নাই। এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া গেল।

একদিন এক সন্ন্যাসী পার্ব্বতীর তপোবনে আসিলেন। পার্ব্বতী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পা ধুইবার জল এবং বসিবার আসন দিলেন। একটু পরে সন্ন্যাসী পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার তপস্যার কোন অসুবিধা হইতেছে না ত? এই তপো-

পার্ব্বতীর শিবপূজা।

India Press, Calcutta.

বনের লতাগুলিতে বেশ নূতন পাতা এবং ফুল হইতেছে ত? তপোবনের হরিণগুলি বেশ সুখে আছে ত? আচ্ছা একটি কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, তোমার বাবা এত বড় লোক, তুমি নিজে এত সুন্দর, তোমার বয়স এত কম, তবুও তুমি তপস্যা কর কেন? সন্ধ্যার আকাশে তারা এবং চন্দ্র ফুটিয়াই যদি ভোরের বেলার মত মলিন হইয়া যায়, তাহা হইলে যেমন হয়, তুমিও এত অল্প বয়সে সব গহনা খুলিয়া ফেলাতে সেই রকম শ্রীহীনা হইয়াছ। তুমি কি স্বর্গ চাও? তোমার বাপের বাড়ীই ত স্বর্গ। তুমি কি কাহাকেও বিবাহ করিতে চাও? তুমি যে এই কথা শুনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলে! তবে তাই কি সত্য? এত বড় আশ্চর্য্য যে, তুমি একজনকে বিবাহ করিতে চাহ, আর সে তোমার মত মেয়েকে চাহে না!" পার্ব্বতী কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহার সখীকে সব কথা বলিতে ইসারা করিলেন। সখী বলিল, "দেখুন, ইনি ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি দেবতাকেও বিবাহ করিতে চাহেন নাই। মহাদেবকেই বিবাহ করিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহার এত সৌন্দর্য্য, তবু মহাদেব ইঁহাকে বিবাহ করিলেন না। তাই ইনি তপস্যা করিতেছেন। কিন্তু হায় এত তপস্যা করিলেন, কই, কোন ফল হইল না ত?" সন্ন্যাসী একটু হাসিলেন, তারপর পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সখী কি পরিহাস করিতেছেন?" পার্ব্বতী বলিলেন, "না, ইনি সত্যই বলিয়াছেন।"

তখন সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমার কিছুমাত্র বুদ্ধি হয় নাই, তাই তুমি শিবকে বিবাহ করিতে চাহিতেছ। দেখ শিবের হাতে ত সাপ জড়ান আছে, সেই হাতে যখন তিনি তোমার হাত ধরিবেন, তখন তোমার ভাল লাগিবে ত? বিবাহের সময় তুমি ত লাল পাটের কাপড় পরিবে, আর শিব পরেন বাঘের চামড়া—তাহা হইতে রক্ত ঝরিতেছে, দুটিতে বেশ মানাবে! আর শিব থাকেন শ্মশানে, সেখানে মড়ার মাথা, আর চুল পড়িয়া থাকে, সেখানে বেড়াইতে তোমার বুঝি ভাল লাগিবে? তোমাকে বিবাহ করিয়া শিব যখন বুড়ো ষাঁড়ে চড়াইয়া বাড়ী লইয়া যাইবে, তখন যে কেহ দেখিবে সেই ত হাসিবে। শিবের যেমন রূপ তেমনি গুণ। তাঁর জন্ম কোথায় কেহই জানে না। আর তিনি ধনবান্ যে কিরূপ তাহা তিনি যে দিগম্বর ইহাতে বেশ বুঝা যায়। ভাল বরের কোন্ গুণটি তাহা হইলে শিবের আছে বলত? শিবকে যে তুমি বিবাহ করিবে এ ইচ্ছাটা যে তোমার শত্রু সেও ভাল বলিবে না। তুমি সে ইচ্ছা ছাড়িয়া দাও।" এই কথা শুনিয়া পার্ব্বতীর বড় রাগ হইল, রাগে তাঁহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "তুমি জান না, তাই এমন কথা বলিতেছ। তুমি নিজে মন্দ লোক তাই ভাল লোকের নিন্দা কর। তিনি জগতের প্রভু, তাঁর ধন বা রূপের কি প্রয়োজন? তাঁহার কিছুই নাই অথচ তাঁহা হইতে জগতের সকল ঐশ্বর্য্যেরই উৎপত্তি; তিনি শ্মশানে

থাকেন অথচ তিনি জগতের রাজা। তাঁহার রূপ যে কেমন তাহাই বা কে বলিতে পারে। কখন তিনি অলঙ্কারে বিভূষিত, কখন বিষধর কৃষ্ণ সর্পই তাঁহার ভূষণ; কখন পরিধান ব্যাঘ্র-চর্ম্ম, কখন বা পট্টবস্ত্র; তাঁহার শিরোভূষণ কখন নরকপাল কখনও বা চন্দ্র। তিনি নির্ধন, কিন্তু যখন তিনি তাঁহার বৃষে চড়িয়া যান, তখন ঐরাবত হইতে দেবরাজ ইন্দ্রকেও নামিতে হয়। মহাদেবের চরণের অঙ্গুলি মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিয়া তিনি আপনাকে ধন্য মনে করেন। তোমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করিয়া কি হইবে? আমি মহাদেবকে বিবাহ করিব তা তিনি ভালই হউন, আর মন্দই হউন।" সেই সন্ন্যাসী কি বলিতে যাইতে-ছিলেন। পার্ব্বতী ভাবিলেন, লোকটা বুঝি মহাদেবের আরও নিন্দা করিবে। এই মনে করিয়া রাগে পার্ব্বতী সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে সন্ন্যাসী শিবের মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তিনি সত্য সত্যই শিব, পার্ব্বতীকে ছলনা করিতেছিলেন। তাহার পর তিনি পার্ব্বতীকে ধরিয়া ফেলিলেন। পার্ব্বতী অবাক্ হইয়া গেলেন। শিব বলিলেন, "আজ হইতে আমি তোমার দাস হইলাম। তুমি তপস্যা দ্বারা আমাকে কিনিয়া ফেলিয়াছ।" সেই দিন হ'তে পার্ব্বতীর তপস্যা ফুরাইল—এত যে কষ্ট পাইয়াছিলেন তিনি সব ভুলিয়া গেলেন। তার পর একদিন মহাদেব ঘটা করিয়া বেশ সুন্দর বর সাজিয়া হিমালয়ের ঘরে আসিলেন। হিমালয় তাঁহাকে

খুব আদর করিয়া বসাইলেন। তাহার পর পার্ব্বতীর সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল। বাপ মায়ের নিকট হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় লইয়া পার্ব্বতী শ্বশুর-বাড়ী চলিয়া গেলেন।

ধর্ম্ম ব্যাধ।

কৌশিক নামে একজন ব্রাহ্মণ অনেক তপস্যা করিয়াছিলেন। একদিন তিনি এক গাছের তলায় বসিয়া বেদপাঠ করিতেছেন, এমন সময়ে এক বক তাঁহার উপরে পূরিষ ত্যাগ করিল। ব্রাহ্মণ খুব রাগিয়া গেলেন, চক্ষু লাল করিয়া তিনি বকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, বক তৎক্ষণাৎ পুড়িয়া ছাই হইয়া নীচে পড়িল। বক মরিয়া গেলে ব্রাহ্মণ অতিশয় দুঃখিত এবং আপনার তপস্যার শক্তি দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। তাহার পর তিনি ভিক্ষা করিবার জন্য নগরে গেলেন এবং ভিক্ষা করিতে করিতে এক গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। গৃহস্থ বাটীতে ছিল না। তিনি গৃহিনীর নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। গৃহিনী ভিক্ষা আনিতে গেলেন ব্রাহ্মণ বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

স্ত্রী ভিক্ষাপাত্র পরিষ্কার করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার স্বামী আসিলেন। স্বামী ক্ষুধাতুর ও ক্লান্ত। স্ত্রী পতিকে দেবতা বলিয়া মানিতেন, ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা না দিয়াই পতিসেবা করিতে লাগি-

লেন। কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করিতে করিতে স্ত্রী ব্রাহ্মণের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। পতি সুস্থ হইয়া সুখে উপবেশন করিলে পর ব্রাহ্মণ যে দাঁড়াইয়া আছেন ইহা মনে করিয়া তিনি লজ্জিত হইলেন এবং ভিক্ষা লইয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণ রাগিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছেন, "গৃহিণি, তোমার এ কি ব্যবহার! তুমি আমাকে দাঁড়াইতে বলিয়া যাইয়া আমার কথা কিরূপে একবারে ভুলিয়া গেলে। তোমার নিকট ব্রাহ্মণ অতিথি কেহ নহেন, পতিই বুঝি সব হইলেন! তুমি কি জান না অথবা কখন কি শুন নাই যে, ব্রাহ্মণ একবার রাগিয়া গেলে পৃথিবীকে তিনি পুড়াইয়া ফেলিতে পারেন।" গৃহিণী মৃদুস্বরে বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, আমি বক নহি, আপনি রাগিয়া আমার কি করিবেন? আমি দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথি, ভৃত্য ইহাদের সেবা করিয়া থাকি, কিন্তু পতিসেবায় যে ধর্ম্ম হইয়া থাকে, আমি তাহাই ভক্তিভরে পালন করি। পতিসেবার ফল আপনি দেখুন; আপনি যে রাগিয়া বককে পুড়াইয়া ফেলিয়াছেন, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। আপনি ব্রাহ্মণদিগের ক্রোধের কথা বলিয়াছেন, আমি তাহা বেশ জানি। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের ক্রোধ যেমন অসীম তাঁহাদিগের প্রসাদও সেইরূপ।" ব্রাহ্মণ অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে আর ক্রোধ নাই, বিস্ময় আসিয়াছে। পতিব্রতা আরও বলিলেন, "দেখুন ক্রোধ মানুষের প্রধান শত্রু। যাঁহার ক্রোধ আর

কাম নাই তিনিই ব্রাহ্মণ। আপনি বেদ অধ্যয়ন করেন, আপনি সত্যবাদী এবং শুচি, কিন্তু আপনি জিতেন্দ্রিয় নহেন, আপনি এখনও ক্রোধ জয় করিতে পারেন নাই। আমার বিবেচনায় আপনি যথার্থ ধর্ম্ম কি তাহা জানিতে পারেন নাই। মিথিলায় যাইয়া ধর্ম্ম ব্যাধের নিকট আপনি ধর্ম্ম শিক্ষা করুন। আমি স্ত্রীলোক, আপনি আমার চপলতা ক্ষমা করিবেন।”

পতিব্রতার মিষ্টি তিরস্কারে ব্রাহ্মণের চৈতন্য হইল, তিনি আপনাকে ধিক্কার দিলেন, এবং পতিব্রতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মিথিলার দিকে চলিলেন। অনেক নদী, পর্ব্বত, গ্রাম, নগর, বন, অতিক্রম করিয়া তিনি অবশেষে মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। মিথিলা খুব সুন্দর সহর। সেখানে কত ভাল ভাল দোকান, বড় বড় বাড়ী কত সুন্দর বাগান,—রাস্তায় হাতী ঘোড়া অনেক লোক সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেছে। প্রজারা কেমন সুখে আছে, সকলেই হৃষ্ট পুষ্ট। সেখানে নিত্য নূতন উৎসব, আর খুব সমারোহ। মিথিলা জনক রাজার কত সুখের রাজধানী। ব্রাহ্মণ সেই নগরে আসিলেন, আসিয়া ধর্ম্ম ব্যাধের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাস্তার লোক সকলেই আগ্রহের সহিত ধর্ম্ম ব্যাধের দোকান দেখাইয়া দিল।

ব্রাহ্মণ এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন,—দেখিলেন কয়েক-জন লোক হরিণ বধ করিতেছে, ব্যাধ মাংস বিক্রয় করি-

তেছে। ব্রাহ্মণ যে দাঁড়াইয়া আছেন তাহা ব্যাধ মনে মনে জানিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকটে গিয়া প্রণাম করিল, আর বলিল, "আমিই ব্যাধ; পতিব্রতা যে আপনাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন তাহা আমি জানি, এখন আমি কি করিব বলুন।" ব্রাহ্মণ মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, এই নীচ ব্যবসায়ী ব্যাধ এ সম্বন্ধে আমার মনের কথা কি করিয়া জানিল? ব্যাধ তাহা জানিতে পারিয়া বলিল, "হে ব্রাহ্মণ, এই স্থান আপনার অযোগ্য, আপনি আমার গৃহে চলুন।" ব্যাধ তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া সেবা করিল। ব্রাহ্মণ সুস্থ হইয়া বসিলেন এবং ব্যাধকে বলিলেন, "তোমার এই মাংস বিক্রয় কার্য্য আমার বিবেচনায় অতিশয় হেয়। এই নিষ্ঠুর কার্য্য তোমাকে করিতে দেখিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি।"

ব্যাধ উত্তর করিল, "মহাশয়, দেখুন আমি এখন যে কার্য্য করিতেছি উহা অতিশয় নিষ্ঠুর সন্দেহ নাই, কিন্তু হেয় নয়। কোন কর্ম্মই জগতে হেয় নয়। মানুষের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম অনুসারে তাহার এ জন্মের প্রকৃতি গঠিত এবং তাহার ঐ প্রকৃতি অনুসারেই এ জন্মের কর্ম্মের ঔচিত্য অনৌচিত্য বিবেচিত হয়। এই প্রকৃতিজাত কর্ম্মকে হেয় জ্ঞান করা অজ্ঞতা মাত্র। এইজন্য আমি এই নীচোচিত কার্য্যকে নীচ বলিয়া মনে করি না। আর যদি এই কার্য্য নীচ বলিয়াই ধরা যায়, তথাপি আমার এই কর্ম্ম

হইতে এখন মুক্ত হইবার উপায় নাই কারণ পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম অনুসারেই আমার এ জন্মের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত। আমি যদি আমার পূর্ব্ব কর্ম্মজাত প্রকৃতিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কর্ম্ম করিতে যাই তাহা আমার পক্ষে মিথ্যাচার হইবে। আর মিথ্যাচারের দ্বারা কখনই শ্রেয় লাভ হয় না।

"অতএব হে ব্রাহ্মণ! আমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল স্বরূপ এই কার্য্য করিতেই হইবে। সেই জন্য ইহা আমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম অনুসারে হইতেছে জানিয়া আমি এই কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লজ্জা বোধ করি না।

"কিন্তু আপনি যদি বলেন যে, আমি চেষ্টা করিয়া এ কর্ম্ম ত্যাগ করিনা কেন, তাহা হইলে আমি বলিব যে তাহাও অসম্ভব। কারণ লতা যেমন বৃক্ষের অবলম্বন ব্যতীত ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না সেইরূপ পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম অথবা দৈবকে আশ্রয় না করিয়া পুরুষকার সফল হয় না। বীজের বৃক্ষত্বে পরিণত হওয়ার জন্য কেবল মাত্র পরিশ্রম আবশ্যক, ইহা মনে করা ভুল, ভূমিরও উর্ব্বরতার বিশেষ প্রয়োজন নচেৎ সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হইবে; এবং এই উর্ব্বরতা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলমাত্র।

"আবার যদি কর্ম্মকে বন্ধন বলিয়া মনে করেন, যদি মনে করেন যে এই নীচ কর্ম্ম আমাকে উন্নতির দিকে না লইয়া গিয়া নীচের দিকে টানিয়া রাখিবে, তাহা হইলে আমার উত্তর এই যে, কর্ম্মই কর্ম্ম

বন্ধন ছেদনের উপায়। যেমন চলিতে চলিতে যদি পদদ্বয় আবদ্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে চেষ্টা করিয়া সেই বন্ধন ছেদন করিতে হয়; সেইরূপে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের দ্বারা যে বন্ধন আমি সৃজন করিয়াছি এজন্মে সেই বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া তাহার ছেদনের চেষ্টা করিতে হইবে। সেই বন্ধনকে স্বীকার না করিয়া যদি তাহা হইতে দূরে থাকিয়া অন্য কর্ম্ম করিতে যাই, তাহা হইলে সেই বন্ধন যতক্ষণ না ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ তাহা জন্ম হইতে জন্মান্তরে আমাকে অনুসরণ করিবে।

"এই জন্য আমি যে জীবন পাইয়াছি তাহাতেই সন্তুষ্ট ও অকুণ্ঠিত থাকিয়া কার্য্য করিয়া যাইতেছি। সমস্ত বন্ধনের মধ্যে থাকিয়াও আমি আমার আন্তরিক মুক্ততা অনুভব করিতেছি, তাই আমায় কোনও বাসনা কোনও কামনা আবদ্ধ করিতে পারিতেছে না। হে ব্রাহ্মণ, যদি আপনি সেই মুক্ততা অনুভব করিতে চান তাহা হইলে সংসারে থাকিয়া, কাম ক্রোধাদির মধ্যে থাকিয়া, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া মুক্ত হউন। নতুবা তাহারা আপনার সমস্ত তপস্যা সমস্ত চেষ্টার মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত থাকিয়া যাইবে, এবং অবসর পাইলেই বাহির হইয়া পড়িবে। আপনি ইতি পূর্ব্বে বকের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছেন। অতএব হে ব্রাহ্মণ! আপনি এখনও কামক্রোধ জয় করিতে পারেন নাই, সেই জন্য সংসারের মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিয়া

পাপের সঙ্গে যুদ্ধ করুন, বাসনা কামনার মধ্যে থাকিয়া স্বয়ং স্থিরতা লাভ করিবার চেষ্টা করুন। কর্ম্মফলের জন্য ব্যস্ত না হইয়া ভগবানকে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিতে পারিলেই আপনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইবেন।

এই বলিয়া ধর্ম্মব্যাধ ব্রাহ্মণকে তাহার বৃদ্ধ মাতাপিতার নিকট লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, "এই পিতামাতাই আমার আরাধ্য দেবতা, যাহা দেবতাদিগের প্রতি কর্ত্তব্য আমি ইঁহাদিগের প্রতি সেইরূপ করিয়া থাকি। পিতামাতার সেবা শুশ্রূষা করা অপেক্ষা আমি গৃহস্থের আর কোন উচ্চতর ধর্ম্ম জানি না। আমার বর্ত্তমান সিদ্ধি কেবল পিতামাতারই সেবা করিয়া লাভ করিয়াছি। হে ব্রাহ্মণ, আপনি আপনার পিতামাতার অনুমতি না লইয়াই গৃহত্যাগ করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। তাঁহারা আপনার জন্য দুঃখে এখন অন্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য আপনি শীঘ্র গৃহে গমন করুন, নতুবা আপনার সমস্ত তপস্যা ব্যর্থ হইবে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হে সাধু, তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য সন্দেহ নাই। আমি ভাগ্যক্রমে তোমার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। আমি নরকে পড়িতেছিলাম, তোমার মিত্রতা লাভ করিয়া আজ আমি পরিত্রাণ পাইলাম। আমি তোমার কথানুসারে সত্বর যাইয়া আমার বৃদ্ধ পিতামাতার শুশ্রূষা করিব। হে ধর্ম্মজ্ঞ, আমার বিবেচনায় তুমি শূদ্র হইলেও ব্রাহ্মণ, কেন না ব্রাহ্মণ

হইবার একমাত্র কারণ সৎকর্ম্মনিষ্ঠা। যে ব্রাহ্মণ অসৎ কর্ম্ম করে সে শূদ্রতুল্য, যে ধর্ম্মবিষয়ে সর্ব্বদাই উদ্যোগী তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা করি। হে পুণ্যাত্মন্, তুমি কি কর্ম্মদোষে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা জানিতে আমার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছে। তুমি তাহা আমাকে বল।" ব্যাধ বলিল, "হে ব্রাহ্মণ, আমি পূর্ব্ব জন্মে আপনার মত একজন বিদ্যাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ছিলাম। একজন রাজা আমার বন্ধু ছিল, তাহার সহিত মৃগয়া করিতে যাইয়া আমি একদিন মৃগবোধে একজন ঋষিকে আহত করি। সেই ঋষির শাপে আমি শূদ্র হইয়া জন্মিয়াছি। আত্মকৃত কর্ম্মদোষের জন্য আজ আমার এই অবস্থা।"

অতঃপর ব্রাহ্মণ বলিলেন "মানুষ এই প্রকারেই আপনার কর্ম্মফলের জন্য সুখ দুঃখ ভোগ করে। তোমার কল্যাণ হউক, ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করুক এই আমার প্রার্থনা। সম্প্রতি আমি তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করি।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ ব্যাধকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। গৃহে গমন করিয়া সংযত হইয়া বৃদ্ধ পিতামাতাকে তিনি সেবা করিতে লাগিলেন।

গো পালন।

গরু হিন্দুদিগের সর্ব্বস্ব ধন। অতি প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে গরুর সেবা শুশ্রূষা প্রচলিত আছে। পূর্ব্বকালে আমাদের রাজাদিগের মধ্যে অনেকেই গরু পুষিতেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে, বিরাটরাজার ষাট হাজার গরু ছিল। মোগল সম্রাট আকবরেরও বহুশত গরু ছিল। তিনি জাতিতে মুসলমান হইলেও আমাদের দেশ হইতে গোহত্যা প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

গরুর শরীরের সকল দ্রব্যই ব্যবহারে লাগে। বাল্যকালে জননী এবং গাভী এই উভয়ের স্তন্য পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয় বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রকারেরা গরুকে মাতার মত ভক্তি করিতে বলিয়াছেন। এখনও আমাদের দেশের বালিকারা গোকালব্রত নামে গরুর পূজা করিয়া থাকে। গরুকে গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া তাহারা উহার কপালে হলুদ চন্দন ও সিন্দূরের ফোঁটা দেয় এবং ফুল লইয়া পদ পূজা করে। তাহার পর উহার তৃপ্তির জন্য দুর্ব্বাঘাস ও কলা খাইতে দিয়া মন্ত্র পড়ে,—

গোকাল গোকুলে বাস,
গরুর মুখে দিয়ে ঘাস,
আমার হোক স্বর্গ বাস।

গরুর মূত্র ও বিষ্ঠা সকল গৃহস্থেরই প্রয়োজনীয়। গোমূত্রে রজকেরা বস্ত্র ধৌত করে এবং গোময় শুষ্ক করিয়া লোকে কাষ্ঠের ন্যায় জ্বালাইয়া থাকে। মহাভারতে আছে যে গরুরা লক্ষ্মীকে বলিয়াছিল যে আমরা আপনাকে সম্মান করিব, আপনি আমাদিগের মূত্রে ও পুরীষে বাস করুন। লক্ষ্মী তাহাদিগের প্রার্থনায় নিত্যই গোমূত্রে ও গোময়ে অবস্থান করেন। বস্তুতঃ গৃহস্থের পক্ষে গরু যেরূপ উপকারী এরূপ উপকারী পশু আর নাই। বাল্যকালে মাতৃস্তন্য ত্যাগ করিয়া আমরা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত গরুর দুগ্ধে পুষ্টিলাভ করি—গরু সাক্ষাৎ মা ভগবতী।

গোপালন কার্য্যে এই কয়টি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ রাখা উচিত। গ্রীষ্মকালে শীতল গাছের ছায়ায় এবং শীতকালে গরম গৃহে গরু রাখা উচিত। গোগৃহ খুব ছোট হওয়া উচিত নহে, একটি গরু রাখিতে হইলে গৃহটি লম্বে ছয় হাত, প্রস্থে পাঁচ হাত ও উচ্চে আট হাত হইলে ভাল হয়। গৃহে যাহাতে বেশ আলো এবং বাতাস আসে তাহাও দেখা উচিত। মক্ষিকা নিবারণের জন্য গোগৃহে ধূম দিতে হয়।

প্রভাতকালে ৫টা হইতে ১০টা এবং বৈকালে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত প্রত্যহ দুইবার করিয়া গরু মাঠে চরাণ উচিত। বৃন্দাবনের গোপাল নন্দদুলাল পীতবাস পরিধান করিয়া খুব প্রত্যুষে গাভীগুলি লইয়া মাঠে মাঠে যাইতেন। কখনও বা কদম্বমূলে বসিয়া গোবৎস-

গণকে আদর করিতেন। আজও সেই রাখাল গোপালকে হিন্দুরা ভক্তিভাবে পূজা করিয়া থাকেন। গোচারণ মাঠে দুর্ব্বল অথবা বৃদ্ধ বৃষ চরিতে দেওয়া উচিত নহে। গরুকে প্রত্যহ দুই বার করিয়া আধ সের খইল এবং দুই ডাবা খড় ও তদুপযোগী জল দেওয়া উচিত। গাভী প্রসব করিলে প্রথম ছয় দিন শুষ্ক খাদ্য দিতে হয়, এবং একুশ দিন পর্য্যন্ত দোহন করা উচিত নহে। তাহার পর দোহন করিতে হয়। গাভী যখন দুগ্ধ দিতে থাকে, সেই সময় ইহাকে প্রত্যহ এক পোয়া ফেন অথবা দুই সের মাসকলাই সিদ্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। একটি গরু প্রতিপালন করিতে হইলে মাসিক এইরূপ আয় ব্যয় হইবে,—

ব্যয়		আয়	
খইল	৩৲	দুগ্ধ বিক্রয়	১০৲
খড়	১॥০	ঘুঁটে অথবা জমির সার	।০
ফেন	॥০		১০।০
দুগ্ধ দোহনের জন্য গোয়ালার মাহিনা	॥০		
অন্যান্য খরচ	॥০		
	৬৲		

গরু প্রত্যহ ⁄২॥ সের করিয়া দুধ দিলে আট মাসে মোট ⁄৬০০ সের দুধ দিবে। টাকায় ⁄৫ সের দুধ ধরিলে, উহা হইতে

গোষ্ঠ-উৎসব।
("গৃহস্থ" হইতে)

India Press, Calcutta.

মোট ১২০৲ অথবা গড়ে মাসিক ১০৲ হয়। মাসিক ব্যয় ৬৲ এবং আয় ১০৲ সুতরাং মাসিক লাভ ৪৲। অধিকন্তু গোময়কে যদি ঘুঁটে অথবা জমির সার করিয়া বিক্রয় করা যায় তাহা হইলে মাসিক অন্ততঃ ।০ আয় হইবে। সুতরাং গাভী প্রতিপালন করিলে প্রত্যেক মাসে ৪।= আয় করিয়া একজন লোক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে।

আমাদের দেশে আধুনিক সময়ে গোজাতির যে অবনতি হইতেছে তাহা আমাদিগের পক্ষে খুব অকল্যাণকর, সন্দেহ নাই। আমরা এই সময়ে যেন বৃন্দাবনে গোযজ্ঞানুষ্ঠানের কথা স্মরণ করি। বৃন্দাবনের গোপগণ প্রতি বৎসর বর্ষাকালে ইন্দ্রের পূজা করিত। তাহাদিগের বিশ্বাস, ইন্দ্রের পূজা করিলে সংবৎসরে আর গরুর কোন বিঘ্ন হইবে না। কৃষ্ণ বৃন্দাবনে থাকিতে এক বৎসর গোপ-গণ উৎসাহের সহিত ইন্দ্রোৎসবের আয়োজন করিতেছিল। গোপাল তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, "আমরা গোয়ালা, যাহাতে গোজাতির উন্নতি হয় তাহাই আমাদিগের করা উচিত। বৃন্দাবনের নিকটে যদি গোবর্দ্ধনগিরি না থাকিত তবে সেখানে গোজাতি থাকা অসম্ভব হইত। পর্ব্বতটি সমস্ত গরুকে পালন করে, ইহার ঘাস একদিন না পাইলে আর গরু বাঁচিত না। অতএব সর্ব্ব প্রথমে গোবর্দ্ধনগিরির পূজা করিয়া গোযজ্ঞ করা উচিত। ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও পর্ব্বতের পূজা করিবে।"

সে বৎসর হইতে ইন্দ্রোৎসব বন্ধ হইল, গোয়ালারা মহা সমারোহে গিরিযজ্ঞ ও গোযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিল। গোকুলের উন্নতিকল্পে গোবর্দ্ধন পূজা আনয়ন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ দেবরাজ ইন্দ্রেরও বিরক্তিভাজন হইতে কুণ্ঠিত হন নাই। আমরা কিন্তু কি স্বার্থের জন্য গাভীগুলিকে অনাহারে রাখিয়া গোচারণ মাঠগুলি অকুণ্ঠিত-চিত্তে বিলাইয়া দিতেছি ?

বাজারে কেনাবেচা।

(১)

অনেক লোকে ত প্রত্যহই হাটবাজারে যাইয়া জিনিস কেনা বেচা করে। আমরাও আজ এখন বাজারে কেনাবেচার কাজ করিতেছি এইরূপ মনে করি; রোজই আমাদিগকে অনেকক্ষণ ধরিয়া দর কষাকষি করিতে হয়, কিন্তু আমরা ভাবি না, কেন একটি জিনিস ৫৲ পাঁচ টাকায় একদিন পাওয়া যায়, এবং কেনই বা আর একদিন উহাই ৫৲ অপেক্ষা কমে বা বেশীতে বিক্রয় হয়। এবিষয় আজ আমরা ধীর ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

লোকে বাজারে যাইয়া, দুধ, চাউল, কাপড়, মাছ শাক-সবজী প্রভৃতি দ্রব্য দোকানদারের নিকট হইতে কিনে, দোকানদারকে তাহারা টাকা পয়সা দেয়। কখনও বা

জিনিসের বদলে জিনিস পাওয়া যায়। গ্রামে অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে চাষী তেলিকে চাউল দিতেছে আর তেলি তাহাকে তেল দিতেছে। এখন কাপড় মাছ, চাউল, শাকসবজী প্রভৃতি দ্রব্যের বিনিময় অথবা কেনাবেচা কেন হয় তাহা দেখিতে হইবে। আমরা চাউল, ডাল, মাছ প্রভৃতি কেন ক্রয় করি? সকলেই বলিবে খাইবার জন্য ক্রয় করি। কাপড় ক্রয় করি কেন? পরিবার জন্য। খাওয়া পরার যোগাড় হইলে আমরা বই কিনি, খেলনা কিনি, যাহা দরকার মনে করি, তাহাই এইরূপে সংগ্রহ করিয়া থাকি। বিনিময় বা কেনাবেচার উপযোগী হইতে হইলে জিনিসের একটি প্রধান গুণ থাকা চাই,—তাহা প্রয়োজনীয়তা। মানুষ যখন যে কোন অভাবের অসুবিধা অনুভব করে তখন তাহা দূর করিতে উদ্যত হয়। দ্রব্যটি তখন তাহার নিকট প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে এবং সে উহা ক্রয় করে।

কিন্তু দ্রব্য প্রয়োজনীয় হইলেই যে কেনাবেচা বা বিনিময়ের উপযোগী হয় তাহা নহে। জল সকলেরই প্রয়োজনীয়, কিন্তু কেহই ত জল বেচাকেনা করে না। ইহার কারণ এই যে জল এত প্রচুর যে আমরা ইহা যত পরিমাণে চাহি তাহাই পাইতে পারি। জল অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়াই ইহার অভাব আমাদিগকে কখনও অনুভব করিতে হয় না। কিন্তু যখন জলের (ক) প্রয়োজন থাকা স্বত্বেও (খ) অপ্রচুর হইয়া উঠে তখন

জলেরও কেনাবেচা করিতে হয়। মানুষ অন্ধকারে থাকিতে পারে না। দিনের বেলায় যখন সূর্য্যের আলো থাকে তখন ধনীনির্ধন সকলেই সমানভাবে আলো পায়, কাহাকেও আলোর দাম দিতে হয় না কিন্তু রাত্রি আসিলে ঘরে প্রদীপ জ্বালিতে হয়, যে ধনী, সে বেশী দাম দিতে পারে এবং উজ্জ্বল আলোতে সব করে, অন্যে অপেক্ষাকৃত কম আলোতে রাত্রি কাটায়।

গ্রামে অনেক পুষ্করিণী আছে, গ্রামের লোককে জলের দাম দিতে হয় না, কিন্তু তাহারা যখন কলিকাতায় আসে এবং বাড়ীর চৌতলায় বসিয়াই জল পাইতে চাহে, তাহাকেও তখন জলের দাম দিতে হয়।

কোন দ্রব্য বিনিময়-সাধ্য বা বেচাকেনার উপযোগী হইতে হইলে ইহাকে (ক) প্রয়োজনীয় ও (খ) অপ্রচুর হইতে হইবে।

আবার এমন অনেক দ্রব্য আছে যাহা আমরা আবশ্যক বোধ করি কিন্তু অপ্রচুর, অথচ ইহার বেচাকেনা আমরা করিতে পারি না। ছেলে কাঁদিলে মা তাহাকে ভুলাইবার জন্য খেলনা আবশ্যক দ্রব্য মনে করেন। খেলনার বেচাকেনা হয় কারণ ইহা (ক) প্রয়োজনীয় (খ) অপ্রচুর। কিন্তু ছেলে যদি খেলনা পাইয়াও কাঁদিতে থাকে, তখন তাহার স্নেহময়ী মা খোকার কপালে একটি টিপ্ দিয়া যাইবার জন্য চাঁদামামাকে অনেক প্রলোভন দেখান। কলুকে যেমন তেলের বিনিময়ে গৃহিণী পুকুরের মাছ, গরুর দুধ

দেন, মা ছেলেকে চাঁদের টিপের জন্য ভাণ্ডারে যাহা কিছু মজুত আছে, যাহা তিনি দিতে পারেন, মাছের মুড়ো, ধানের কুঁড়ো, গরুর দুধ, ইত্যাদি সবই দিতে চাহেন।

কিন্তু কলুর তেলের মত, চাঁদের টিপের কেনাবেচা হয় না। যাহা কিছু আছে সব দিলেও আমাদের চাঁদামামা তাঁহার টিপ্ লইয়া ঘরের দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইবেন না। চাঁদের টিপ, কষ্ট করিলেও পাওয়া যায় না ইহা একেবারেই **অপ্রাপ্য**।

বিনিময়োপযোগী হইতে হইলে দ্রব্যের কি কি গুণ আবশ্যক তাহা আমরা দেখিলাম। বাজারে যে সকল দ্রব্যের আমদানী হয় তাহারা সকলেই (ক) প্রয়োজনীয় (খ) অপ্রচুর ও (গ) আয়াসলভ্য। [কেবলমাত্র দ্রব্য কেন, অনেক সময়ে মানুষের কাজেরও কেনাবেচা হইয়া থাকে। চাকর, কেরাণী, মোক্তার, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি তাহাদের ব্যক্তিগত গুণ অথবা কার্য্যতৎপরতার জন্য পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে। আবার এমন কতকগুলি ব্যক্তিগত গুণ বা শক্তি আছে যাহা টাকা দিলেও অপরের কার্য্যে নিয়োজিত হওয়া অসম্ভব। অর্থ পাইলে দাসীরা পরিচর্য্যা করে, কিন্তু মাতার স্নেহ অর্থের দ্বারা পাওয়া যায় না, ইহা স্বতঃ প্রবৃত্ত, হাট বাজারে ইহার ক্রয় বিক্রয় নাই।]

(২)

শাকসবজী যদি অনায়াসেই পাওয়া যায় এবং যদি ইহার যোগান

ঐ কারণে খুব প্রচুর হয়, ইহার টান যতই বাড়ুক না কেন, যদি ইহার কখনও অকুলান না হয়, তাহা হইলে শাকসবজীর জন্য আমাদিগকে বাজারে যাইতে হইবে না। প্রত্যেকের বাড়ীতে ক্ষেত না থাকাতে, এবং অনেকেই ক্ষেত হইতে শাকসবজী তুলিবার কষ্টটুকু পাইতে অনিচ্ছুক হওয়াতে শাকসবজীরও দাম দিতে হয়। পূজা অথবা উৎসবের দিনে, যখন শাকসবজী, ফলমূল, মাছ, প্রভৃতির যোগান টানের অপেক্ষা কম হয়, অথচ যোগান খুব তাড়াতাড়ি টানের অনুরূপ হওয়া অসম্ভব হয়, তখন ঐ সব দ্রব্যের দাম খুব বাড়িয়া যায়। প্রয়োজন হইলেই আয়োজন হয়, ইহা খুব সত্য। কিন্তু অনেক সময়ে **প্রয়োজনমত আয়োজন হইতে সময় লাগে।** মাছ, ফলমূল, শাকসবজী, দুধ, ছানা, সন্দেশ, প্রভৃতি দ্রব্য দোকানদারেরা ভবিষ্যতের জন্য মজুত করিয়া রাখিতে পারে না, কারণ দুই একদিনের মধ্যেই এই সকল দ্রব্য নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং হাটে যদি এই সকল দ্রব্যের যোগান টান অপেক্ষা খুব বেশী হইয়া যায়, দোকানদারকে লোকসানের ভয়ে অনেক সময়ে ইহাদিগকে মুড়ির দরে ছাড়িয়া দিতে হয়। ইহাদিগের টান বাড়িলে পক্ষান্তরে, যোগান হঠাৎ বাড়ান খুব কঠিন। দূরদেশ হইতে এই সকল দ্রব্য আমদানী করিতে খরচ ও সময় লাগে, পথে দ্রব্য নষ্ট হইয়া যাইবারও সম্ভাবনা থাকে। কাজেই দোকানদারেরা দুই এক দিনের লাভের আশায় দূরদেশ

হইতে জিনিসের আমদানী করিতে শীঘ্র রাজী হয় না। অতএব টান হঠাৎ বাড়িয়া গেলে যতদিন নূতন আমদানী না হয় ততদিন যে সকল ব্যাপারীরা হাটে ঐ সকল দ্রব্য লইয়া আসিয়াছে তাহারা খুব লাভ করিতে পারে। **এই সময়ের জন্য** যোগান টানের অনুরূপ না হওয়াতে, যেমন টান কমিলে মূল্য বাড়ে সেই রূপ টান বাড়িলে মূল্য বাড়ে—**মূল্য কেবলমাত্র টানের উপরই নির্ভর করে।** কিন্তু অনেকদিন ধরিয়া টান বেশী হওয়াতে যখন মূল্য বাড়িবার মুখে থাকে, তখন ব্যাপারীরা গাড়ী নৌকা ও রেলের ভাড়া স্বীকার করিয়াও দূরস্থ গ্রাম বা হাট হইতে ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া আসে। কিছুকালের মধ্যেই যোগান টানের অনুরূপ হয়। সব খরিদদারেরাই তখন আবশ্যক পরিমাণে ঐ দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে বলিয়া মূল্য বাড়িতে পায় না। অতএব দেখা গেল, যে, **যে সময়ের জন্য যোগানের পরিমাণ সীমাবদ্ধ, নির্দ্দিষ্ট, সেই সময়ে মূল্য টানের উপর নির্ভর করে,—কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই যখন যোগান টানের অনুরূপ হয়—মূল্য টান ও যোগান উভয়েরই উপর নির্ভর করে।**

মাছ দুধ প্রভৃতি দ্রব্যের যোগান বাড়ান যাইতে পারে, কিন্তু

হঠাৎ বাড়ান খুব কঠিন। আর একপ্রকার দ্রব্য আছে যাহাদিগের যোগান বাড়ান অসম্ভব। পুরাতন পুঁথি, বড় বড় লোকের জুতা বা কলম অনেকেই সংগ্রহ করিয়া থাকেন। টান যতই হউক না কেন ইহাদিগের যোগান কখনও বাড়িতে পারে না। পুরাতন পুঁথি নূতন করিয়া লেখা যাইতে পারে, কিন্তু পুরাতন বলিয়াই পুঁথিটীর দাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চটী জুতা অনেকের কাছে খুব দামী। ঐতিহাসিকগণও পুরাতন মুদ্রা, পুরাতন ছবি প্রভৃতি দ্রব্য অনেক সময়ে খুব বেশী মূল্যে কিনিয়া লয়। এই সকল দ্রব্যের মূল্য কেবল টানের উপরই নির্ভর করে।

(ক) মাছ, ফলমূল ইত্যাদির মূল্য কিছুকালের জন্য—যতদিন হাটে নূতন আমদানী না হয় সেইকাল যাবৎ—টানের উপর নির্ভর করে, পরে যখন নূতন আমদানী হয় তখন টান এবং যোগান উভয়েরই উপর নির্ভর করে।

(খ) পুরাতন পুথি মুদ্রা, ছবি প্রভৃতির মূল্য কেবল মাত্র টানের উপর নির্ভর করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাজারে যে সকল দ্রব্যের আমদানী হয় তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি, মাছ, তরকারী প্রভৃতি অল্পস্থায়ী, শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। দোকানদারেরা এই সকল দ্রব্য দোকানে মজুত করিয়া রাখে না, কারণ এগুলি সদ্যজাত হইলেই খরিদদারেরা লইবে। পূর্ব্ব হইতে এই সকল দ্রব্যের যোগান

সবসময়ে টানের অনুরূপ করা যায় না বলিয়াই ইহাদিগের দাম চাল, ডাল, লবণ, তৈল, ঘৃত প্রভৃতি বহুকালস্থায়ী দ্রব্য অপেক্ষা সত্বর উঠে বা নামে। জেলেরা নিকটের বা দূরের নদী অথবা খাল হইতে, মোটে বা ভারে, গাড়ীতে, নৌকায়, অথবা রেলে করিয়া মাছ আনিয়া ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাজারে উপস্থিত হয়। একদিন হয়ত যত পরিমাণ দরকার তাহা অপেক্ষা বাজারে অধিক পরিমাণ মাছ আসিল। গ্রাহকের অভাবে মুদিরা যেরূপ চাল, ডাল, সেই দিনের জন্য গুদামে মজুত করিয়া পরদিন বিক্রয় করে; জেলেরা সেরূপ পরদিন বিক্রয় করিবার জন্য মাছ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে না, মাছ পচিয়া গেলে ত বিক্রয় হইবে না, কাজেই জেলেরা সেই দিনই সেই পরিমাণে মাছ বিক্রয় করিতে চেষ্টা করে। জেলে ত একজন নহে, অনেক জেলেই আসিয়াছে, উহারা প্রত্যেকে নিজের যাহাতে লোকসান না হয় সেই ভয়ে অপরের দর অপেক্ষা কম দরে মাছ ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা করে। এদিকে গ্রাহকগণেরও অধিক মাছের প্রয়োজন নাই,—যোগান বেশী অথচ টান কম, কাজেই দর কষাকষি আরম্ভ হয়; এই কারণে বাজারে যত গোলমাল, তাহার মধ্যে সকলের বেশী গোলমাল যেখানে মেছুনীরা থাকে সেই স্থানে, পৃথিবীর সকল স্থানেই বাক্‌যুদ্ধে মেছুনীর নিকটে সকলেই হার মানিয়া থাকে।

চাল, ডাল, লবণ, তৈল প্রভৃতি দ্রব্য পুরাতন হইলেও মন্দ অথবা অপকারী হয় না। যে পরিমাণে প্রয়োজনীয় তাহার অধিক

আনিয়া ফেলিলে, মুদীরা উহাদিগের নষ্ট হইয়া যাইবার ভয় করে না, এজন্য নূতন আমদানী না করিয়া তাহারা উহাই পরদিবস বিক্রয় করে। এইরূপে বাজারে যে পরিমাণ এই সকল দ্রব্যের প্রয়োজন তাহাই দোকানদারেরা সময় মত আনিতে পারে—যোগান ক্রমশঃ টানের অনুরূপ হওয়াতে ইহাদিগের দাম মাছ তরিতরকারীর মত প্রত্যহই বিভিন্ন হয় না।

চাল, ডাল, ঘৃত, তৈল প্রভৃতির মুল্য টান এবং যোগান উভয়েরই উপর নির্ভর করে।

(৩)

তোমরা বোধ হয় সকলেই জান যে বাজারে জিনিসের দাম সব সময়ে এক থাকে না। এক মন চাউল কোন মাসে চারি টাকায় পাওয়া যায়, আবার কখন সেই মাসের মধ্যেই উহা চারি টাকা আট আনার কমে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ তোমরা অনেকেই জান না। বাজারে চাউলের দর কেন বাড়িয়া গেল, চারি টাকা হইতে বাড়িয়া কেন চারি টাকা আট আনা লইল, পাঁচ টাকা অথবা ইহারও বেশী কেন হইল না, তাহার কারণ আজ তোমা-দিগকে বলিব।

প্রথমে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের বাজারের কথা ভাব। মনে কর, গ্রামে উহা ছাড়া আর বাজার নাই। গ্রামের সব লোকই সেই বাজারে যাইয়া চাউল কেনে এবং গ্রামে যত পরিমাণ চাউল উৎপন্ন

হয় তাহার সবই ব্যাপারীরা সেই একই বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য লইয়া যায়, অন্য কোথাও যায় না।

এখন মনে কর দশ জন লোক চাউল লইয়া আসিয়াছে। জমিতে ধান উৎপন্ন করিয়া, তাহা হইতে চাউল প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী করিতে অবশ্য সকলেরই সমান খরচ হয় নাই। এক জনের হয়ত বেশ উর্ব্বরা ভূমি, কর্ষণ করিয়া বৃষ্টির পর বীজ বপন করিলেই প্রচুর পরিমাণে ধান জন্মায়। জল সেচন অথবা সারের খরচ তাহার লাগে না। আর এক জনের জমি তত ভাল নয়। সে জমিতে সার দেয় এবং নদী হইতে নালা কাটিয়া জল আনে, তবে তাহার জমিতে ধান জন্মায়, কাজেই তাহার বেশী খরচ হয়। তৃতীয় কোন ব্যক্তির জমি হয় ত আরও অনুর্ব্বরা এবং বাজার হইতে অনেক দূরে, সে গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া চাউল বাজারে বিক্রয় করিতে আনে। অপর দুই জন অপেক্ষা তাহার খরচ হয়ত আরও অধিক হয়।

এইরূপ দশ জন লোক বাজারে চাউল বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। একই পরিমাণ চাউলের জন্য প্রত্যেকে বিভিন্ন খরচ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কেহ হয়ত এক মণ চাউলের জন্য তিন টাকা খরচ করিয়াছে, কেহ সাড়ে তিন টাকা, আবার কেহ চারি টাকা খরচ করিয়াছে। যে কম খরচ করিয়াছে সে সেই চাউল সস্তায় বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু সে তাহা করে না। সে

জানে যে যাহাদের বেশী খরচ হইয়াছে, তাহারা সেই চাউল বেশী দামে বিক্রয় করিবে, তাহা না করিলে তাহাদের যে লোকসান হয়, লোকসানে ত ব্যবসা চলে না। সুতরাং প্রথমোক্ত ব্যক্তি অধিক লাভের আশায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। বাজারে যে দশজন বিক্রেতা আসিয়াছে তাহারা সকলেই যত বেশী সম্ভব তত বেশী লাভ করিবার আশা করে।

অপর দিকে মনে কর দশ জন লোক চাউল কিনিবার জন্য বাজারে আসিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে নানা প্রকার অবস্থার লোক আছে। কেহ হয় ত বড় লোক; একটু বেশী দাম দিয়াও চাউল কিনিতে পারে, বেশীক্ষণ বাজারে অপেক্ষা করিতে চাহে না। কাহারও হয় ত বাড়ীতে চাউলের টানাটানি, দাম যতই হউক না, তাহাকে চাউল কিনিতেই হইবে, নতুবা তাহার আজ খাওয়া হইবে না। আবার এমন অনেক লোক আছে যাহাদের ঘরে অনেক মণ চাউল মজুত আছে, কিন্তু তাহারা তবুও বাজারে আসিয়াছে; কম দামে চাউল পাইলে আরও কিছু কিনিয়া রাখিবে, এই ইচ্ছা। এইরূপ দশটি ক্রেতা বাজারে আসিয়া বসিয়া আছে, সকলেই দেখিতেছে কখন জিনিসের দাম কমে।

এইরূপে যখন দশটি ক্রেতা এবং দশটি বিক্রেতা একই বাজারে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহাদের মধ্যে দর কষাকষি আরম্ভ হয়। মনে কর দশ জন ব্যাপারীদের মধ্যে চারি জন তিন টাকা

বা সাড়ে তিন টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। অন্য চারি জন চারি টাকা বা সাড়ে চারি টাকা দরে বিক্রয় করিবে। বাকী দুই জনের চাউল প্রস্তুত করিয়া বাজারে আনিবার খরচ এত বেশী পড়িয়াছে যে তাহারা পাঁচ টাকা দরে বেচিবে। উহার কমে বেচিলে তাহাদের ক্ষতি হইবে। খরিদ্দার দশ জনের মধ্যেও তেমনি চারি জনকে আজই চাউল কিনিতে হইবে নতুবা তাহা-দিগকে উপবাস করিতে হইবে। সেইজন্য তাহারা আজ চারি কিম্বা সাড়ে চারি টাকা দরেও চাউল কিনিতে রাজী আছে। অপর চারিজন তিন কিম্বা সাড়ে তিন টাকার চাউল কিনিতে পারে। বাকী দুই জনের ঘরে চাউল মজুত আছে, তবে যদি দুই টাকা মণ চাউল পায় তবে আরও কিছু কিনিয়া আগামী মাসের জন্য রাখিয়া দিতে পারে।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে ব্যাপারীদের মধ্যে কেহই তিন টাকার কমে রাজী নহে এবং খরিদ্দারদের মধ্যে কেহই সাড়ে চারি টাকার বেশী দরে কিনিতে রাজী নয়। কাজেই যে দুই জন ক্রেতা দুই টাকা মণ চাউল কিনিবে মনে করিয়া আসিয়াছিল, তাহারা কিছু না কিনিয়াই বাড়ী ফিরিয়া যাইবে, কারণ এ বাজারে কেহই তিন টাকার কমে বেচিবে না। সেইরূপ ব্যাপারীদের মধ্যে যে দুই জন পাঁচ টাকা মণ দরে বেচিবে মনে করিয়াছিল তাহারাও চাউল না বেচিয়াই বাড়ী ফিরিবে,

কারণ ক্রেতাদের ভিতরে কেহ সাড়ে চারি টাকার বেশী টাকা দিতে রাজি নয়।

তবেই বাকী রহিল আট জন ব্যাপারী ও আট জন খরিদ্‌দার। চারিজন বিক্রেতা তিন টাকা কিম্বা সাড়ে তিন টাকায় ও অপর চারি জন চারি কিম্বা সাড়ে চারি টাকায় বেচিবে। তেমনি চারি জন ক্রেতা তিন কিম্বা সাড়ে তিন টাকায় কিনিবে ও অপর চারিজন চারি কিম্বা সাড়ে চারি টাকায়ও কিনিতে রাজী আছে।

তোমরা হয়ত বলিবে যে, বেশ ত যাহারা সাড়ে তিন টাকায় কিনিতে চায় তাহারা যে লোকেরা ঐ দরে বেচিতে চায় তাহাদের নিকট হইতে কিনুক এবং যাহারা সাড়ে চারি টাকায় কিনিতে চায় তাহারাও সেই রকম যাহারা ঐ দরে বেচিতে চায় তাহাদের নিকট হইতে কিনুক। এই রূপ করিলেই ত গোল চুকিয়া যায়, ইহা কিন্তু অসম্ভব। একই বাজারে এক রকম চাউল দুই রকম দরে বিক্রয় হয় না। ঐ দুই দরের মধ্যে যেটা বেশী সেই দরে বিক্রয় হইবে—সুতরাং চাউলের দর চারি টাকা আট আনা হইল।

চাউল প্রস্তুত করিয়া বাজারে আনিতে বিক্রেতাদিগের যত খরচ হইয়াছে অন্ততঃ সেই টাকাটা না পাইলে তাহাদের লোকসান হয়। কিন্তু যাহারা কম খরচায় সেই এক রকমই চাউল ঐ বাজারে আনিতে পারিয়াছে তাহারা কম দরে চাউল ছাড়িয়া দিবে না।

যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে তাহাদিগের লাভ হয় তাহা হইলে ঐ সুযোগ তাহারা কেন ছাড়িয়া দিবে? খরিদ্‌দারদিগের মধ্যে অনেকেরই বাড়ীতে চাউলের টানাটানি, তাহারা বেশী দামে চাউল কিনিতে ইচ্ছুক। আবার কয়েকজন ব্যাপারী বাজারে চাউল আনিতে অনেক খরচ করিয়াছে, ইহারাও বেশী দামে চাউল বিক্রয় করিবে নতুবা তাহাদের লোকসান হইবে। যে সকল খরিদ্‌দারের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চাউলের দরকার আছে, এবং যে সব ব্যাপারীরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খরচ করিয়া বাজারে চাউল আনিয়াছে তাহারাই বাজার-দর ঠিক করে। অপর ব্যাপারীরা ও খরিদ্‌দারেরা ইহাদের দরে কেনাবেচা করে। এইরূপে চাউলের দর ঠিক হয়। যদি সেই গ্রামের চাউলের দর অন্য কোন গ্রাম বা সহরের দর অপেক্ষা খুব বেশী থাকে এবং ক্রমশঃ বাড়িতেই থাকে এবং যদি ঐ সকল গ্রাম বা সহরের সহিত এই গ্রামের যাতায়াতের সুবিধা থাকে তাহা হইলে ব্যাপারীরা ঐ সকল হাট হইতে চাউল খরিদ করিয়া এই হাটে আনিবে; ক্রমে দুই হাটে চাউলের দর সমান হইয়া যাইবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাংলা দেশ ভারতবর্ষ মহাদেশের একটি অংশ মাত্র। ভারতবর্ষের তিন দিকে সমুদ্র

আর উত্তর দিকে এক খুব লম্বা আর খুব উঁচু পাহাড়। সেই পাহাড়ের নাম হিমালয়। বাহির হইতে আমাদের দেশে আসিতে হইলে, হয় সমুদ্র দিয়া না হয় ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম দিকে দুই পাহাড়ের মধ্যে একটা সরু রাস্তা আছে তাহার ভিতর দিয়া আসিতে হয়।

প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে হিন্দুও ছিল না মুসলমানও ছিল না। তখন এদেশে সাঁওতাল, কোল, ভীল-দিগের মত অসভ্য জাতি বাস করিত। তাহাদিগের রং কাল এবং তাহারা অতিশয় কদাচারী ছিল। সেই জন্য উহাদিগকে হিন্দুরা রাক্ষস বলিতেন। তাহারা চাষ করিতে জানিত না। তাহাদের ঘর বাড়ীও ছিল না, তাহারা বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইত, আর বনের জানোয়ার মারিয়া খাইত। ঐ সময়ে উত্তরপশ্চিম পাহাড়ের রাস্তা দিয়া এক দল নূতন সভ্য জাতি ভারতবর্ষে আসেন, ইঁহারাই পরে হিন্দু বলিয়া পরিচিত হন। তাঁহারা আসিয়া এই সব অসভ্য জাতিদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে জঙ্গলে ও পাহাড়ে তাড়াইয়া দিলেন। এখনকার সাঁওতাল, কোল, ভীলেরা ইহাদেরই বংশধর।

প্রথমে আসিয়াই হিন্দুগণ পঞ্জাব প্রদেশে বাস করেন। ঐ খানে তাঁহারা অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদিগের নাম গান করিয়াছিলেন। যে শ্লোকগুলিতে তাঁহারা দেবতাদিগের নাম গান

করিতেন, ঐ গুলিকে তাঁহারা পরে একত্রিত করিয়া ঋগ্বেদ নাম দিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে পৃথিবীতে কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই। অনেকদিন পর্য্যন্ত হিন্দুরা পঞ্জাব প্রদেশে ছিলেন, তাহার পর ক্রমশঃ তাঁহারা দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে আসিতে লাগিলেন। রামায়ণে যে রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা পড়, প্রকৃতপক্ষে তাহা আর্য্য হিন্দুজাতি-দিগের সহিত রাক্ষস অথবা অনার্য্য জাতির যুদ্ধ। হিন্দুগণ ক্রমশঃ ইহাদিগের দেশ দখল করিয়া ইহাদিগকে বনে পাহাড়ে তাড়াইয়া দিলেন। এবং তাঁহারা অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করিলেন। অনেক সময়ে ছোট ছোট রাজাদিগের মধ্যে খুব যুদ্ধ হইত এবং একজন বেশী বলবান রাজা অন্য রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া এক এক সময়ে একচ্ছত্র সম্রাট হইতেন। কুরুক্ষেত্রে একবার খুব বড় যুদ্ধ হইয়াছিল। ইহাতে ভারতবর্ষের সকল রাজাই কৌরব অথবা পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ভারতের সম্রাট বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই রকম অনেক দিন চলিল।

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে গৌতম নামে একজন রাজ-পুত্র রাজ্য ও স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। মানুষ কেন দুঃখ ভোগ করে, এই প্রশ্ন তিনি মনের মধ্যে সর্ব্বদাই চিন্তা করি-তেন এবং ইহার মীমাংসা করিবার জন্য তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া বনে গেলেন। একজন রাজপুত্র সিংহাসন ছাড়িয়া যে ছয় বৎসর

কাল কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত থাকিতে পারে ইহা আমাদিগের দেশে ভিন্ন অপর কোন দেশে কখনও দেখিতে পাওয়া যায় নাই, কিন্তু গৌতম কঠোর তপস্যা করিয়াও তাঁহার প্রশ্নের উত্তর পাইলেন না। অবশেষে শরীরকে কষ্ট দেওয়া বৃথা মনে করিয়া তিনি শান্ত হইলেন, এবং এক বড় বট গাছের তলায় ধীরভাবে চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞানলাভ করিলেন। তখন হইতে তাঁহার নাম বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী হইল। মানুষ যদি কথায়, কাজে এবং চিন্তায় পাপ না করে তাহা হইলেই তাহাকে আর দুঃখের বোঝা বহিতে হইবে না, ইহা তিনি বুঝিলেন; এবং যজ্ঞে অসংখ্য পশু বলি দিলেই যে সংসারের জ্বালা হইতে কেহ মুক্ত হইতে পারে তাহার ভুল দেখাইয়া বুদ্ধদেব অহিংসাকে পরমধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিলেন। ভারতবর্ষের অনেক লোক তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

অশোক নামে খুব একজন বড় রাজা বৌদ্ধ হইলেন; বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। প্রজারা যাহাতে সুখে থাকে তিনি সর্ব্বদাই সেই চেষ্টা করিতেন, তাহাদিগের জন্য তিনি হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগের ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য রাজ্যের বিভিন প্রদেশে শিলায় উপদেশ খোদিত করিয়া দিয়াছিলেন। অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের ফলেই আজও পর্য্যন্ত তিব্বত, ব্রহ্ম, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে লক্ষ লক্ষ লোক ভক্তিভরে বুদ্ধকে পূজা করেন।

ধ্যানী বুদ্ধ।

India Press, Calcutta.

অশোকের মৃত্যুর অনেক দিন পরে তাঁহার সিংহাসনে রাজা বিক্রমাদিত্য বসিয়াছিলেন। তোমরা অনেকেই ইঁহার নাম গল্পে শুনিয়া থাকিবে। কালিদাস, বরাহমিহির, অমরসিংহ প্রভৃতি নয় জন পণ্ডিত—নবরত্ন—তাঁহার সভা আলো করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের প্রকৃত নাম চন্দ্রগুপ্ত, ইনি গুপ্ত বংশীয় রাজা। এই গুপ্ত বংশীয় রাজাদিগের সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা শুনিলে তোমরা আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে। তোমরা কেহই হয়ত জাহাজ দেখ নাই। কিন্তু পূর্ব্বে আমরা নিজেরাই খুব বড় বড় জাহাজ তৈয়ারী করিতাম এবং জাহাজে চড়িয়া বিদেশে বানিজ্য করিতে যাইতাম। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে রোমক রাজ্যের সহিত আমাদিগের দেশের বানিজ্য চলিত। আবার কেবল বাণিজ্য করিয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতাম না দূর বিদেশে যাইয়া আমরা সেখানে রাজ্য স্থাপন করিতেও চেষ্টা করিতাম। তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে বুদ্ধের জন্মের কিছু পূর্ব্বে—এখন হইতে আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে—বিজয়সিংহ নামে একজন বাঙ্গালী রাজকুমার জাহাজে চড়িয়া লঙ্কায় গিয়াছিলেন এবং সেখানকার রাজাকে পরাজিত করিয়া সেখানে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন হইতে লঙ্কার নাম সিংহল হইল। তখনকার জাহাজের দুই একটা নাম,—ভীমা, চপলা, নন্দী। তোমাদিগকে যে গুপ্ত রাজাদিগের কথা বলিলাম

তাঁহাদিগের রাজত্বকালে—এখন হইতে দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে—হিন্দুরা জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র পার হইয়া যবদ্বীপে গিয়াছিলেন এবং তথায়ও আর একটি রাজ্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। যে রকম জাহাজে তাঁহারা গিয়াছিলেন তাহার ছবি যবদ্বীপের বলভদ্র মন্দিরে খোদিত আছে। ইহাদিগের মাস্তুলগুলো খুব উঁচু ছিল। হিন্দুরা এই রকমে অনেক বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করিলেন।

তাহার পর,—এখন হইতে প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে—মুসলমানেরা ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমে পাহাড়ের মধ্যে সেই একই রাস্তা দিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। প্রথমে তাঁহারা লুট করিয়া চলিয়া যাইতেন। পরে—দুই শত বৎসরের পর,—একটু একটু করিয়া তাঁহারা দেশ জয় করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ ইঁহারা সমস্ত ভারতবর্ষের রাজা হইলেন। তখনকার জমিদারেরা নিজের নিজের জমিদারীর শান্তিরক্ষা করিতেন, তাঁহারা চোরকে সাজা দিতেন, প্রজাদের মোকদ্দমা মিটাইয়া দিতেন। এখন সে সব কাজ সরকারের লোকেরাই করে। এই রকম অনেক দিন চলিল।

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সাহেবরা এই দেশে আসিলেন। তাঁহারা সমুদ্র দিয়া আসিয়াছেন। প্রথমে তাঁহারা এখানে ব্যবসা করিতে আসিয়াছিলেন। তখন মুসলমান রাজত্ব ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। দেশে শান্তিরক্ষার ভাল বন্দোবস্ত নাই। ইংরাজেরা দুই একটা দুর্গ তৈয়ার করিলেন। ছোট ছোট নবাবের সঙ্গে

তাঁহাদিগের মাঝে মাঝে যুদ্ধ হইত। এই সময়ে দক্ষিণ প্রদেশে মহারাজ শিবাজী যে মারহাট্টা জাতি লইয়া রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও খুব বড় হইয়া উঠিয়াছিল। ইঁহার সহিতও ইংরাজদিগকে অনেক যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। প্রায়ই সাহেবরা জয়লাভ করিতেন। তাহার পর তাঁহাদের মনে হইল যে ভারতবর্ষ জয় করা খুব কঠিন হইবে না, আর জয় করিতে পারিলে তাঁহাদিগের ব্যবসায়ের অনেক সুবিধা হইবে। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্দৌলাকে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ইংরাজেরা বাংলার রাজা হইলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহারা জয় করিয়া ফেলিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই ভারতবর্ষে তিন জাতি রাজত্ব করিল। প্রথম—হিন্দুর রাজত্ব প্রায় চারি হাজার বৎসর ধরিয়া। দ্বিতীয়—মুসলমানের রাজত্ব—প্রায় সাত শত বৎসর ধরিয়া। তৃতীয়—সাহেবদের রাজত্ব—ইহা দেড় শত বৎসর হইল।

দিদিহারা।

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই
মাগো, আমার শোলোক-বলা কাজলা দিদি কই?
পুকুর ধারে, নেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে
ফুলের গন্ধে ঘুম আসেনা, একলা জেগে রই;
মাগো, আমার কোলের কাছে কাজলা দিদি কই?

সেদিন হ'তে দিদিকে আর কেনই বা না ডাকো,
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো,
খাবার খেতে আমি যখন দিদি বলে' ডাকি তখন
ও ঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসেনাকো
আমি ডাকি,—তুমি কেন চুপটি ক'রে থাকো।

বল্ মা, দিদি কোথায় গেছে, আস্‌বে আবার কবে
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুঁতুল বিয়ে হবে!
দিদির মতন ফাঁকি দিয়ে, আমিও যদি লুকাই গিয়ে—
তুমি তখন এক্‌লা ঘরে কেমন ক'রে রবে
আমিও নাই, দিদিও নাই—কেমন মজা হবে!

ভুঁই চাঁপাতে ভরে গেছে শিউলি গাছের তল,
মাড়াস্‌নে মা পুকুর থেকে আন্‌বি যখন জল;
ডালিম গাছের ডালের ফাঁকে বুল্‌বুলিটি লুকিয়ে থাকে
উড়িয়ে তারে দিস্‌নে মাগো ছিঁড়তে গিয়ে ফল,—
দিদি এসে শুন্‌বে যখন, বল্‌বি কি মা বল।

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই
এমন সময়, মাগো, আমার কাজ্‌লা দিদি কই?

বেড়ার ধারে, পুকুর পাড়ে ঝিঁঝি ডাকে ঝোপে ঝাড়ে
নেবুর গন্ধে ঘুম আসেনা—তাইতো জেগে রই ;
রাত হ'ল যে, মাগো, আমার কাজ্‌লা দিদি কই ?

ছুটী।

(রবি বাবুর গল্প গুচ্ছ, ২য় ভাগ।)

বালকদিগের সর্দ্দার ফটিক চক্রবর্ত্তীর মাথায় চট করিয়া একটী নূতন ভাবোদয় হইল। নদীর ধারে একটী প্রকাণ্ড সাল কাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়াছিল। স্থির হইল, সেটী সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

যে ব্যক্তির কাঠ, আবশ্যককালে তাহার যে কতখানি বিস্ময়, বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।

কোমর বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গম্ভীরভাবে সেই গুঁড়ির উপর গিয়া বসিল ; ছেলেরা তাহার এরূপ উদার ঔদাসিন্য দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া গেল।

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু আধটু ঠেলিল কিন্তু সে তাহাতে কিছু মাত্র বিচলিত হইল না ; এই অকালতত্ত্বজ্ঞানী মানব সকল প্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ফটিক আসিয়া আস্ফালন করিয়া বলিল, "দেখ্, মা'র খাবি! এইবেলা ওঠ!"

সে তাহাতে আরও একটু নড়িয়া চড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়ীরূপে দখল করিয়া লইল। এরূপ স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলম্বে এক চড় কসাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্ত্তব্য ছিল—সাহস হইল না। কিন্তু এমন একটা ভাব ধারণ করিল, যেন ইচ্ছা করিলেই এখনই উহাকে রীতিমত শাসন করিয়া দিতে পারে, কিন্তু করিল না, কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা আর একটা ভাল খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে; তাহাতে আর একটু বেশী মজা আছে। প্রস্তাব করিল, মাখনকে শুদ্ধ ঐ কাঠ গড়াইতে আরম্ভ করা যাক।

মাখন মনে করিল, ইহতে তাহার গৌরব আছে; কিন্তু অন্যান্য পার্থিব গৌরবের ন্যায় ইহার আনুসঙ্গিক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে, তাহা তাহার কিম্বা আর কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল—মার-ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো। গুঁড়ি এক পাক ঘুরিতে না ঘুরিতেই মাখন তাহার গাম্ভীর্য্য, গৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞান সমেত ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাতীত ফল লাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা হৃষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছু শশব্যস্ত হইল।

মাখন তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা ছাড়িয়া ফটিকের উপরে গিয়া পড়িল, একেবারে অন্ধভাবে মারিতে লাগিল। তাহার নাকে মুখে আঁচড় কাটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল। খেলা ভাঙ্গিয়া গেল। ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া একটী অর্দ্ধ নিমগ্ন নৌকার গলুইএর উপরে চড়িয়া বসিয়া চুপ্‌চাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল। এমন সময় একটী বিদেশী নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটী অর্দ্ধ বয়সী ভদ্রলোক কাঁচা গোঁপ এবং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চক্রবর্ত্তীদের বাড়ী কোথায়?"

বালক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল, "ওই হোথা।"

কিন্তু কোন্ দিকে যে নির্দ্দেশ করিল, কাহারও বুঝিবার সাধ্য রহিল না।

ভদ্রলোকটী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা?" সে বলিল, "জানিনে" বলিয়া পূর্ব্ববৎ তৃণমূল হইতে রস গ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। বাবুটী তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া চক্রবর্ত্তীদের গৃহের সন্ধানে চলিলেন।

অবিলম্বে বাঘা বাগ্‌দি আসিয়া কহিল, "ফটিক দাদা, মা ডাকছে।"

ফটিক কহিল, "যাবনা।"

বাঘা তাহাকে বলপূর্ব্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল, ফটিক নিস্ফল আক্রোশে হাত পা ছুড়িতে লাগিল।

ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া কহিলেন, "আবার তুই মাখনকে মেরেছিস্ ?"

ফটিক কহিল, "না মারিনি।"

"ফের মিথ্যা কথা বল্‌ছিস্ ?"

"কখ্‌খনো মারিনি ! মাখনকে জিজ্ঞাসা কর !"

মাখনকে প্রশ্ন করাতে মাখন আপনার পূর্ব্ব নালিশের সমর্থন করিয়া বলিল, "হ্যাঁ মেরেছে।"

তখন আর ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে এক শশব্দ চড় কসাইয়া দিয়া কহিল, "ফের মিথ্যে কথা !"

মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার পৃষ্ঠে তিনটী প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল।

মা চিৎকার করিয়া কহিলেন, "অ্যাঁ তুই আমার গায়ে হাত তুলিস্ ?"

এমন সময়ে সেই কাঁচা পাকা বাবুটী ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "কি হচ্ছে তোমাদের ?"

ফটিকের মা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া কহিলেন, "ওমা, এ যে দাদা ! তুমি কবে এলে ?" বলিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিলেন।

বহুদিন হইল, দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুই সন্তান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িয়া

উঠিয়াছে ; তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পায় নাই। আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বম্ভর বাবু তাঁহার ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন।

কিছু দিন খুব সমারোহে গেল। অবশেষে বিদায় লইবার দুই এক দিন পূর্ব্বে বিশ্বম্ভর বাবু তার ভগিনীকে ছেলেদের পড়া শুনা এবং মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে ফটিকের অবাধ্যতা ও উশৃঙ্খলতা, পাঠে অমনোযোগ, এবং মাখনের সুশান্ত ও সুশীলতা ও বিদ্যানুরাগের বিবরণ শুনিলেন।

তাঁহার ভগিনী কহিলেন, "ফটিক আমার হাড় জ্বালাতন করিয়াছে।"

শুনিয়া বিশ্বম্ভর বাবু প্রস্তাব করিলেন, "তিনি ফটিককে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন। বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন। ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে ফটিক মামার সঙ্গে কল্‌কাতায় যাবি ?"

ফটিক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "যাব," যদিও ফটিককে বিদায় দিতে তাহার মায়ের আপত্য ছিল না, কারণ তাঁহার মনে সর্ব্বদাই আশঙ্কা ছিল কোন্ দিন সে মাখনকে জলেই ফেলিয়া দেয়, কি মাথাই ফাটায়—কি, একটী দুর্ঘটনা ঘটায়, তথাপি ফটিকের বিদায় গ্রহণের জন্য এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন।

"কবে যাবে" "কবে যাবে" করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল; উৎসাহে তাহার নিদ্রা হয় না।

অবশেষে যাত্রা কালে আনন্দের ঔদার্য্য বশতঃ তাহার ছিপ, ঘুড়ি, লাটাই, সমস্ত মাখনকে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিবার পুরা অধিকার দিয়া গেল।

কলিকাতায় মামার বাড়ী পৌঁছিয়া প্রথমত মামীর সঙ্গে আলাপ হইল। মামী এই অনাবশ্যক পরিবার বৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার নিজের তিনটী ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটী তেরো বৎসরের অপরিচিত, অশিক্ষিত পাড়া গেঁয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কিরূপ একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়! বিশ্বম্ভরের এত বয়স হইল, তবু কিছুমাত্র যদি কাণ্ডজ্ঞান আছে।

বিশেষতঃ তেরো চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মত পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোন কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধ আধ কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি, এবং কথামাত্রই প্রগলভতা। হঠাৎ কাপড় চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানান্ রূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্দ্ধা স্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য

এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সে জন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোন স্বাভাবিক অনিবার্য্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্ব্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও যেন ঠিক খাপ খাইতেছে না; এই জন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বদা লজ্জিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোন সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিম্বা সখ্য লাভ করিতে পারে তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ, সেটা সাধারণে প্রশ্রয় দেওয়া বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মত হইয়া যায়।

অতএব এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর কোন অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারিদিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মত বিঁধে। মামীর স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দুর্গ্রহের মত প্রতিভাত হইতেছে, এইটা ফটিককে সবচেয়ে বাজিত। মামী যদি দৈবাৎ তাহাকে কোন একটা কাজ করিতে বলিতেন, তাহা হইলে সে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে বেশী কাজ করিয়া ফেলিত, অবশেষে মামী যখন তাহার

উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন, "ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে! ওতে আর তোমার হাত দিতে হবে না! এখন তুমি নিজের কাজে মন দাওগে! একটু পড়গে যাও!" তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মামীর এতটা যত্নবাহুল্য তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার উপর আবার হাঁপ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আট্‌কা পড়িয়া কেবলি তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।

প্রকাণ্ড একটা ঢাউস ঘুঁড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, "তাইরে নাইরে নাইরে না" উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত রাগিনী আলাপ করিয়া অকর্ম্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদী-তীর, দিনের মধ্যে যখন তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সঙ্কীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেই সব দলবল, উপদ্রব, স্বাধীনতা এবং সর্ব্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।

জন্তুর মত একপ্রকার অবুঝ ভালবাসা—কেবল একটা কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোধূলি সময়ের মাতৃহীন বৎস্যের মত কেবল একটা আন্তরিক মা মা ক্রন্দন—সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলি আলোড়িত হইত।

স্কুলে এত বড় নির্ব্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। মাষ্টার যখন মার আরম্ভ করিত, তখন ভারক্লান্ত গর্দ্দভের মত নীরবে সহ্য করিত, ছেলেদের যখন খেলিবার ছুটী হইত, তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়ীগুলার ছাদ নিরীক্ষণ করিত; যখন সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে কোন একটা ছাদে দুটি একটি ছেলে মেয়ে কিছু একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত, তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।

একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"মামা, মার কাছে কবে যাব?"

মামা বলিয়াছিলেন, "স্কুলের ছুটী হোক।" কার্ত্তিক মাসে পূজার ছুটী, সে এখনো ঢের দেরী।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল, একেত সহজে পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাষ্টার তাহাকে অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে, তাহার এমন অবস্থা হইল যে, তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোন অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্ব্বক বেশী আমোদ প্রকাশ করিত।

অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামীর কাছে নিতান্ত অপরাধীর মত গিয়া কহিল, "বই হারিয়ে ফেলেছি।"

মামী অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন "বেশ করেচ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার বই কিনে দিতে পারিনে।"

ফটিক আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল—সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে এই মনে করিয়া মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল, নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া সেই রাত্রে তাহার মাথা ব্যথা করিতে লাগিল এবং গা সির্‌সির্‌ করিয়া আসিল। বুঝিতে পারিল, তাহার জ্বর আসিতেছে। বুঝিতে পারিল, ব্যামো বাধাইলে তাহার মামীর প্রতি অত্যন্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামী এই ব্যামোটাকে যে কিরূপ একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের স্বরূপ দেখিবে তাহা সে উপলব্ধি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্ম্মণ্য অদ্ভুত নির্ব্বোধ বালক পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর কাহারও কাছে সেবা পাইতে পারে, এরূপ প্রত্যাশা করিতে লজ্জাবোধ হইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দ্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিন আবার রাত্রি হইতে মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে। সুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বম্ভর বাবু পুলিশে খবর দিলেন।

সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ী আসিয়া বিশ্বম্ভর বাবুর বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনও ঝুপ্‌ঝাপ্ করিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে; রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দুইজন পুলিশের লোক গাড়ী হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বম্ভর বাবুর নিকট উপস্থিত করিল, তাহার আপাদ মস্তক ভিজা, সর্ব্বাঙ্গে কাদা, মুখ চক্ষু লোহিতবর্ণ, থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে, বিশ্বম্ভর বাবু প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মামী তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"কেন বাপু, পরের ছেলে নিয়ে কেন এ কর্ম্মভোগ! দাও, ওকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও।"

বাস্তবিক, সমস্ত দিন দুশ্চিন্তায় তাহার ভালরূপে আহারাদি হয় নাই, এবং নিজের ছেলেদের সহিত ও নাহক অনেক খিট্‌মিট্ করিয়াছেন।

ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।"

বালকের অত্যন্ত জ্বর বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর বাবু চিকিৎসক লইয়া আসিলেন।

ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু একবার উন্মীলিত করিয়া কড়িকাঠের দিকে হতবুদ্ধিভাবে তাকাইয়া কহিল, "মামা আমার ছুটি হয়েছে কি ?"

বিশ্বম্ভর বাবু রুমালে চোখ মুছিয়া সস্নেহে ফটিকের শীর্ণ তপ্ত হাত খানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

ফটিক বিড়বিড় করিয়া বকিতে লাগিল—বলিল, "মা, আমাকে মারিস্‌নে মা। সত্যি বলছি, আমি কোন দোষ করিনি।"

পর দিন দিনের বেলা কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশায় ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার নীরবে দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিশ্বম্ভর বাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "ফটিক, তোর মাকে আন্‌তে পাঠিয়েচি।"

তাহার পর দিনও কাটিয়া গেল। ডাক্তার চিন্তিত বিমর্ষ মুখে জানাইলেন, অবস্থা বড়ই খারাপ।

বিশ্বম্ভর বাবু স্তিমিত প্রদীপে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই ফটিকের মাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাসীদের মত সুর করিয়া বলিতে লাগিল, "এক বাঁও মেলে না। দোবাঁও মেলে—এ-এ- না।" কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা ষ্টীমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসীরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত; ফটিক প্রলাপে তাহারই অনুকরণে করুণ স্বরে জল মাপিতেছে এবং সে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময়ে ফটিকের মাতা ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই উচ্চ কলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বহুকষ্টে তাঁহার শোক নিবৃত্ত করিলে, তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "ফটিক, সোনার মাণিক আমার!"

ফটিক যেন অতি সহজেই উত্তর দিয়া কহিল, "অ্যাঁ।"—মা আবার ডাকিলেন, "ওরে ফটিক, বাপধন রে!"

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "মা এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ী যাচ্চি।"

ধর্ম্মঘট।

বাদল রাম হাল্‌ওয়াই
গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান,
ধর্ম্মঘটের মস্ত চাঁই
দেখ্‌তেও ঠিক পালোয়ান।
মোটা রকম বুদ্ধিটা, তার
কণ্ঠস্বর ও মধুর নয়,
কিন্তু যে কাজ কর্ব্বে স্বীকার,—
কর্ব্বেই তা স্থনিশ্চয়।
ছ' ছ' দিনের ধর্ম্মঘটে
বিকিয়েছে সর্ব্বস্ব তার,
অন্ন মোটে আর না জোটে
তবুও গাড়ী যোতেনি আর।
হোথায় যত সওদাগরে
কাম্‌’ড়ে মরে নিজের হাত,
হেথায় সে সপরিবারে
শুকায়, ঘরে নাইক ভাত।
হপ্তা গেল; পত্নী তাহার
দু’দিন আছে উপবাসে

যুত্‌'তে গাড়ী ব'ল্‌তে গিয়ে
শিক্ষা ভাল পেয়েছে সে।
শিশুটি তা'র ব্যাপার দেখে
কাঁদ্‌তে যেন গেছে ভুলে,
শান্তমুখী মেয়েটী আজ
ভয়ে ভয়ে নয়ন তুলে।
ছেলে মেয়ের কষ্টে সে যে
মোটেই ছিল নাক' সুখে,
স্পষ্ট সেটা লেখাই ছিল—
তার সে বিষম কাল মুখে ;
তারই সঙ্গে লেখা ছিল
হৃদয়ের বল বিলক্ষণ,
বিকট ঘৃণা, বিষম জ্বালা,
সবার উপর অটল পণ !
ধনীর ধনের উপরে যে
পরিশ্রমের আছে মান,
যদিও এটা নাই সে বোঝে
নয় সে তবু ক্ষুদ্র প্রাণ,
বাদল রাম ! বাদল রাম !
গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান !

বাদল রাম   বাদল রাম
দেখ্‌তে শুন্‌তে পালোয়ান !
সূক্ষ্ম নহে   বুদ্ধিটা তার,
কণ্ঠস্বরও মিষ্ট নয় ;
কিন্তু যে কাজ   কর্ব্বে স্বীকার
কর্ব্বে সে তা সুনিশ্চয় ।

দুই বিঘা জমি ।

শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভূঁই, আর সবি গেছে ঋণে ।
বাবু বলিলেন, "বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে ।"
কহিলাম আমি, "তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই ;
চেয়ে দেখ মোর, আছে বড়জোর, মরিবার মত ঠাঁই ।"
শুনি রাজা কহে, "বাপু জানতহে, করেছি বাগান খানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দীঘে সমান হইবে টানা,—
ওটা দিতে হবে ।"—কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজল চক্ষে, "করুন্ রক্ষে গরীবের ভিটে খানি !
সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া !"

আঁখি করি লাল রাজা ক্ষনকাল রহিল মৌনভাবে,
কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, "আচ্ছা সে দেখা যাবে!"
পরে মাস দেড়ে ভিটেখানি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—
করিল ডিক্রি, সকলি বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে!
এ জগতে হায়, সেই বেশী চায় আছে যার ভূরি ভূরি।
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি!
মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্ত্তে,
তাই লিখি দিল বিশ্ব নিখিল দু বিঘার পরিবর্ত্তে!
সন্ন্যাসিবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য,
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য।
ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি,
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারিনে সেই বিঘা দুই জমি!
হাটে মাঠে বাটে এই মত কাটে বছর পনেরো ষোল,
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়ই বাসনা হোলো।
নমো নমো নমঃ, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি!
অবারিত মাঠ, গগন-ললাট চুমে তব পদ-ধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লব ঘন আম্র কানন, রাখালের খেলাগেহ,
স্তব্ধ অতল দীঘি কালোজল, নিশীথশীতল স্নেহ।

দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে।
কুমোরের বাড়ী দক্ষিণে ছাড়ি, রথ-তলা করি বামে।
রাখি হাটখোলা নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে।
বিদীর্ণ হিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারিদিকে চেয়ে দেখি ;
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে, সেই আম গাছ একি !
বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালককালের কথা !
সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে নাহিক ঘুম,
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম।
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন,—
ভাবিলাম হায় আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন !
সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে,
দুটি পাকাফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে ;
ভাবিলাম মনে বুঝি এতক্ষণে আমারে চিনিল মাতা !
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা !
হেনকালে হায় যমদূতপ্রায় কোথা হতে এল মালী !
ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি।
কহিলাম তবে, "আমিত নীরবে দিয়েছি আমার সব,
দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব।"

চিনিল না মোরে নিয়ে গেল ধরে' কাঁধে তুলি লাঠিগাছ,
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ সাথে ধরিতে চিলেন মাছ !
শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন্, "মারিয়া করিব খুন !"
বাবু যত বলে, পারিষদদলে বলে তার শতগুণ।
আমি কহিলাম, "শুধু দুটি আম ভীখ্ মাগি মহাশয় !"
বাবু কহে হেসে, "বেটা সাধুবেশে পাকা-চোর অতিশয় !"
আমি শুনে হাসি, আঁখি জলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে !
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।

———

৬। বৈঠকখানা (কলিকাতা)

ছাত্র-সংখ্যা—৪৮। বালক ও যুবকদিগের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ আছে।

শিক্ষণীয় বিষয়—ইতিহাস, ভূগোল, নীতি ও সামান্য বিজ্ঞান। নজের ছাত্রগণের জন্য খাতা এবং পুস্তক বাঁধাই শিখান হইতেছে। স্কুল কলেজের ত্রগণ অল্পমূল্যে খাতা পাইবেন।

৭। গোয়াবাগান (কলিকাতা)

ছাত্র-সংখ্যা—৩০। হিন্দী ও বাঙ্গালা শিখান হয়। নীতিশিক্ষা ও সংবাদ-ত্র পাঠ হয়।

৮। নারিকেলডাঙ্গা (কলিকাতা)

ছাত্র-সংখ্যা—১৭।

৯। ধামাসিন

কৃষক ও দরিদ্র শ্রমজীবীবালকগণ ইহাতে পড়িয়া থাকে, বালকেরা স্তোত্র পাঠ রলে পর স্কুলের দৈনিক কার্য্য আরম্ভ হয়।

১০। সোমপাড়া (মুর্শিদাবাদ)

প্রত্যেক বিদ্যালয়েই ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রেরা নামূল্যে পুস্তক শ্লেট প্রভৃতি পাইয়া থাকে।

কলেজ এবং স্কুলের ছাত্রেরা বিদ্যালয়গুলির পরিচালনা করিতেছেন। মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ খোপাধ্যায়, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এ কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ তেছেন।

ইণ্ডিয়া প্রেস—২৪নং মিডিলরোড, ইটালী, কলিকাতা হইতে
শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গীয় শ্রমজীবি-শিক্ষা-পরিষদের তত্ত্বাবধানে

পরিচালিত নৈশবিদ্যালয়-সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। (গোরাবাজার, বহরমপুর)

ছাত্র-সংখ্যা—৩০। ৭ জন ধোপা, ২ নাশিত, ৩ মুদী, ৩ গোয়ালা, ৪ কু:
৫ মুসলমান, ২ মুচি, ৭ ছুতার, মজুর ইত্যাদি।

শিক্ষণীয় বিষয়—গণিত, অঙ্কন, বস্তুবিদ্যা, ইতিহাস, নীতি। সপ্ত
২ দিন কাঠের কাজ শিখান হয়। প্রস্তুত দ্রব্য স্থানীয় ভদ্রলোকগণ ক্রয় ক
থাকেন। কাষ্ঠদ্রব্য বিক্রয়ের লাভের অংশ শ্রমজীবিগণ লইয়া থাকে।

২। কাদাই (বহরমপুর, কৃষ্ণনাথ স্কুল-গৃহ)

ছাত্র-সংখ্যা—৩৫। ১২ মজুর, ৫ দপ্তরী, ১১ রাখাল, ৩ চাকর, ৪ ধোপ

শিক্ষণীয় বিষয়—গোরাবাজার নৈশবিদ্যালয়ের ন্যায়। এখানে
কাঠের কাজ হইয়া থাকে।

৩। চোঁয়াপুর (বহরমপুর ষ্টেশনের নিকট)

ছাত্র-সংখ্যা—৩০। ২ ছুতার, ১০ রাখাল, ১০ ডোম, ৬ নমঃশূদ্র, ২ মজ

শিক্ষণীয় বিষয়—গণিত, বস্তুবিদ্যা, ইতিহাস ও নীতিশিক্ষা।

৪। তেঘরিয়া (২৪ পরগণা)

ছাত্র-সংখ্যা—৫৬। উচ্চপ্রাথমিক পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় ও কিছু ইংর
পড়ান হয়। লাইব্রেরী ও খেলিবার জায়গা আছে।

৫। মাণিকতলা (কলিকাতা)

ছাত্র-সংখ্যা—২২। ৯ জন ছাপাখানার কাজ করে, ৫ জন পাখা টা
১ দোকানদার, ১ কম্পোজিটর, ১ ময়রা, ১ সেকরা, ৪ চাকর মজুর ইত্যাদি।